মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ

পরিবেশক ঃ
সাহিত্য মন্দির
৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
ডি. ঘোষ
কলিকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রচ্ছদ পট : শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
১২এ, কৈলাস বসু
কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের
শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ

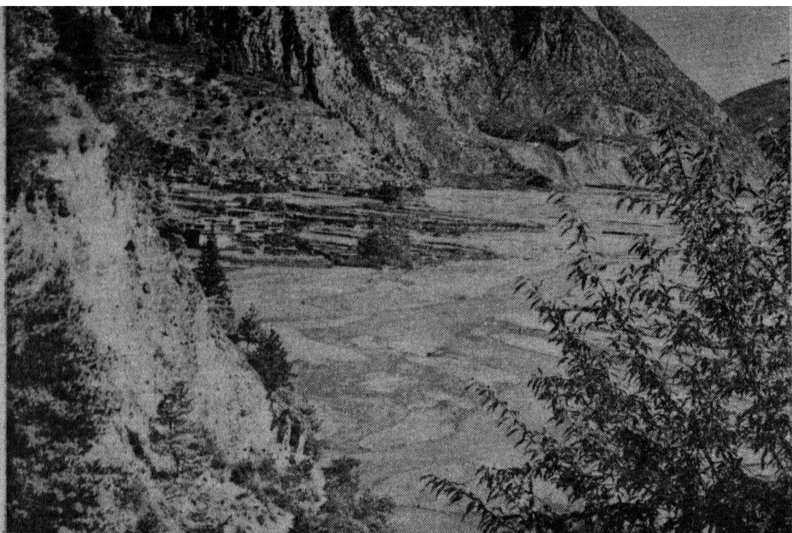


জুমস্থমে প্রবেশপথে বর্ধিষ্ণু মার্ফা গ্রাম



মুক্তিনাথ গ্রাম, শেষপ্রান্তে মন্দির

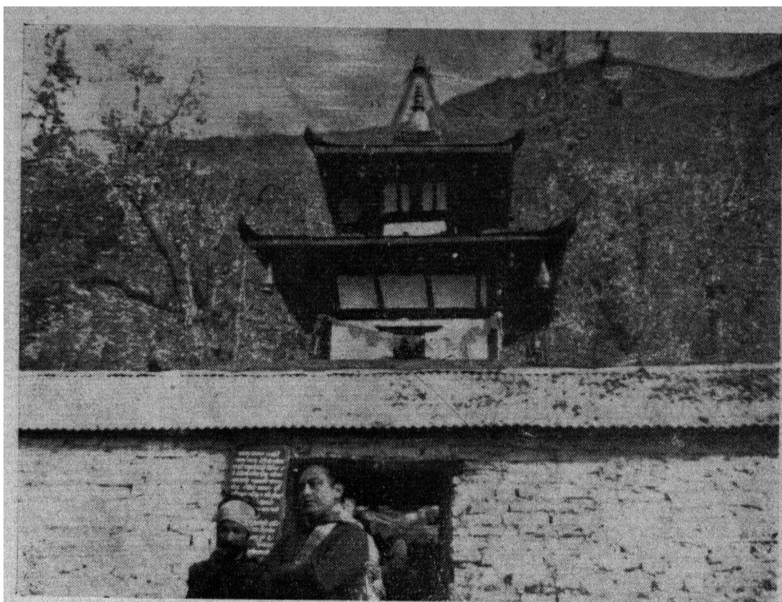
[অমিয়দাসের সৌজন্যে]



পাহাড় ঘেরা কালীগঙ্গার বুকে লার্জুং গ্রাম



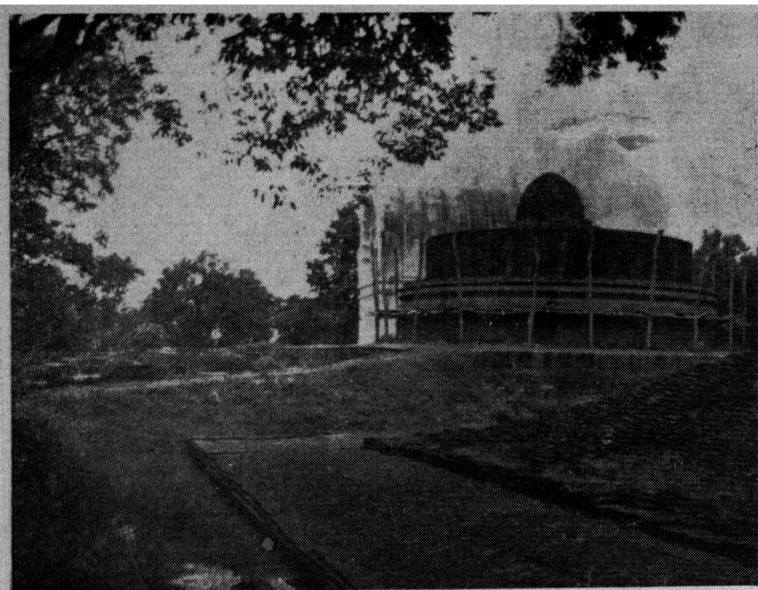
মুক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশপথে শেষ চড়াই পথ



মুক্তিনাথের মন্দিরদ্বারে লেখক



পোখরা থেকে মচ্ছপুছারে



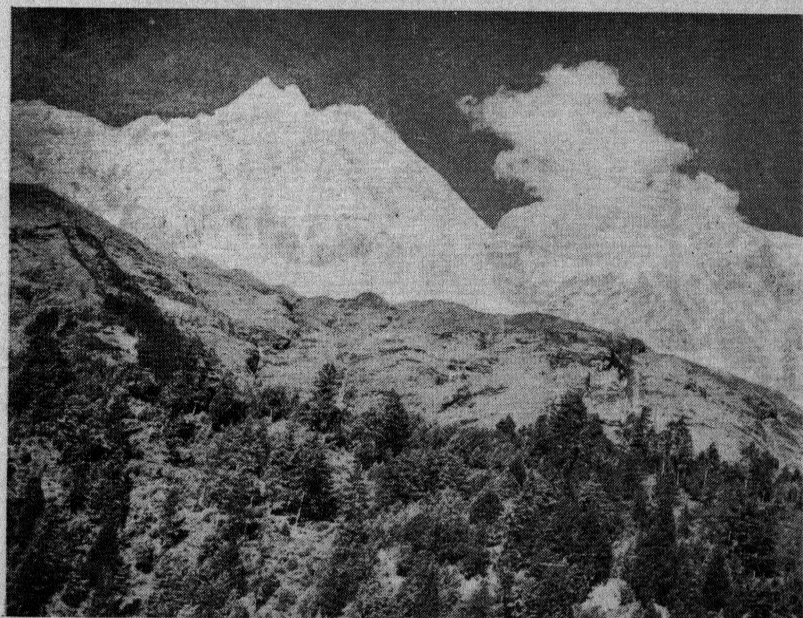
কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধের তিরোধানক্ষেত্রে স্মৃতিস্তম্ভ



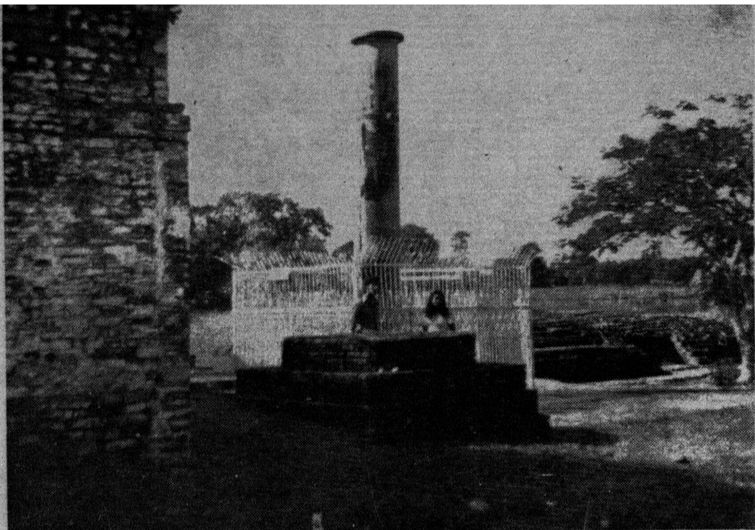
কাগবেনী ছাড়িয়ে মুক্তিনাথের পথে ধূসর উপত্যকা পথ



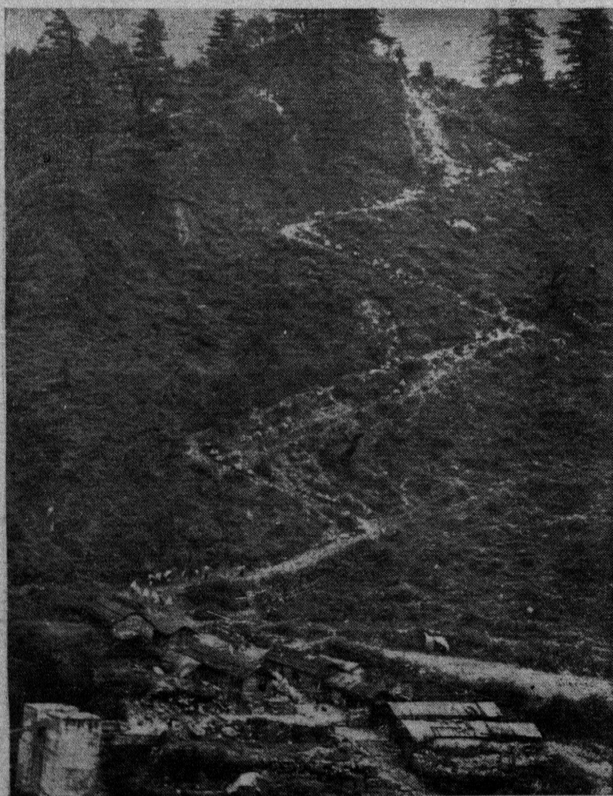
লেতে ব্রীজের কাছে শ্বেতীগঙ্গা ও কালীগঙ্গার সঙ্গমস্থল



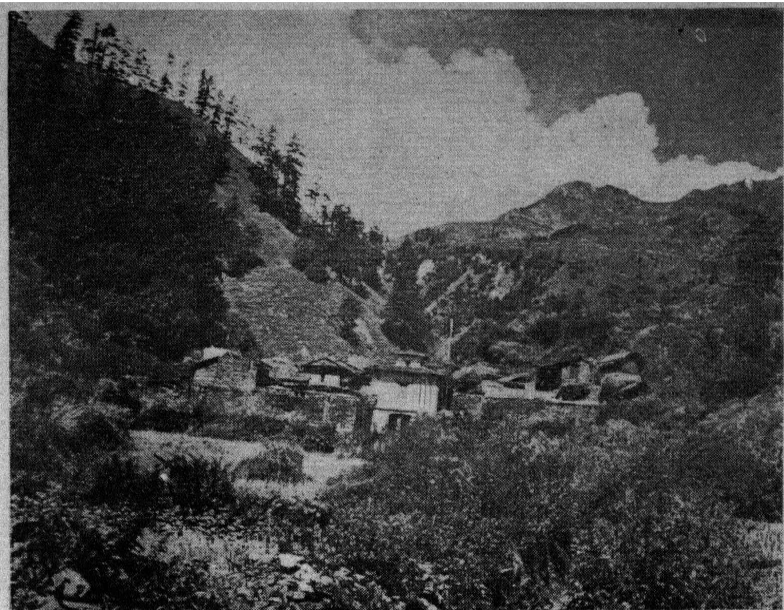
লারজুং থেকে ধৌলাগিরি [অমিয় দাসের সৌজন্যে]



ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানে অশোকনির্মিত স্তম্ভ



লেভে থেকে কালাপানির পথে তীব্র চড়াই

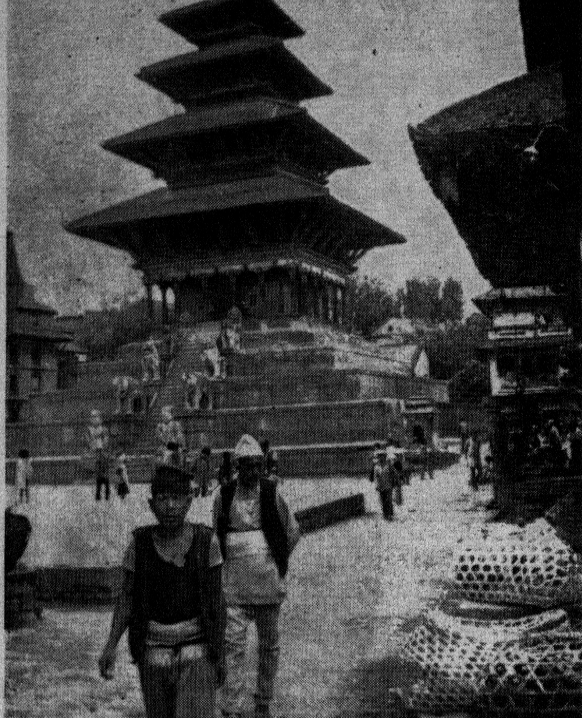


কালীগঙ্গার ধার দিয়ে ধ্বস নামা পথ



সুউচ্চ পাহাড়ের কোলে শস্য সবুজ ঘাসা গ্রাম

[অমিয় দাসের সৌজন্যে]



নেতাপোলা মন্দির (ভাটগাঁও বা ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার)



পশুপতিনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার

॥ এক ॥

মুক্তিনাথ। মুক্তিতীর্থ। নেপাল হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থপীঠ।

নেপালের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কাছাকাছি এই মহাতীর্থ। জিলা মুস্তাং। চারিদিকে শুধু পাহাড়ের ঢেউ। বেশীর ভাগ রুক্ষ পাথর। কোথাও বা সবুজ গালিচার আস্তরণ। গাছপালা ক্বচিৎ নজরে পড়ে।

বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে তুষার শুভ্র অন্নপূর্ণা গিরিশৃঙ্গ। ভগবান মুক্তিনাথের অতন্দ্র প্রহরী।

এই প্রশস্ত উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলেছে কালীগঙ্গার অমৃত ধারা। মুক্তিনাথের পদরেণু বহন করে এই অমৃত প্রবাহ ক্রমশঃ নেমে এসেছে সমতলের দিকে।

মুক্তিনাথ পাহাড়ের মাথায় রয়েছে এই কালীগণ্ডকীর উৎস। সেই স্রোতধারা একশ আটটি ঝরণা ধারায় বিভক্ত হয়ে অবিরাম ঝরে পড়ছে মন্দির প্রাঙ্গণে। এই হিমশীতল পূতঃ ধারায় স্নান করে ভক্তরা দেবতার চরণে পূজো দেয়। কামনা করে প্রেমময় নারায়ণের অপার করুণা। মহা শান্তি।

আমরা চলেছি সেই মহাতীর্থে। বহুদিনের স্বপ্ন, যা এতকাল শুধু কল্পনায় ভেসে বেড়াতো আজ তা বাস্তবে ঘটতে চলেছে। নেপাল হিমালয়ের দুর্গম সেই প্রান্তে, সেই মহাতীর্থপথে আমরা এগিয়ে যাব। ভয় নেই, ভাবনা নেই, নেই কোন দুশ্চিন্তা। তাঁর ডাক শুনেইতো ঘর ছেড়ে পথে নেমেছি। অতএব পথের ভাবনা তো তাঁরই।

কতবার তো ভেবেছি মুক্তিনাথ যাব। প্রত্যেকবারই কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছি। ঘুরেফিরে আবার সেই চিরন্তন উপলব্ধি। তীর্থের দেবতা না ডাকলে তীর্থদর্শন হয় না। এবার যখন ডাক

পেয়েছি তখন শুধু নির্ভয়ে পথ চলা। অতএব মাভৈঃ। চল এগিয়ে চল সেই অমৃতময় মহাতীর্থে। মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথে।

দীর্ঘ যাত্রাপথ। পৌঁছতে হবে নেপালের উত্তরপশ্চিম প্রান্তসীমায়। একেবারে তিব্বত সীমান্তে। জিলা মুস্তাং। তারি শেষ প্রান্তে শেষ গ্রাম ঝাড়কোট। গ্রামের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে মুক্তিনাথের মন্দির।

নেপাল সীমানার মধ্যে হলেও এখানে পুরোপুরি তিব্বতী পরিবেশ। চেহারায় আচার আচরণে এবং জীবন যাত্রায় তিব্বতী প্রভাব প্রকট। নেপালের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বেশ অমিল। শোনা যায় এই সেদিনও নাকি এ অঞ্চলটা তিব্বতী খাম্পাদের অধীন ছিল। তাই এখানকার শ্রেষ্ঠ দেবমন্দির মুক্তিনাথের পূজার রীতিনীতিতেও লামাতন্ত্রের প্রভাব। ঠিক এধরণের প্রভাব দেখেছিলাম লহুল স্পিতি অঞ্চলে। বিশেষ করে ত্রিলোকনাথের মন্দিরে।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, ধর্মীয় দুই পৃথক ধারা কেমন অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে। কোন বিভেদ নেই। নেই কোন আচারের বিধি নিষেধ। একে যেন অন্যের পরিপূরক। তাই এসব তীর্থ একই সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধের আনন্দময় মুক্তিতীর্থ।

মুক্তিনাথও এই দ্বৈত সত্তার মিলনতীর্থ। ভারত এবং নেপালের হিন্দু তীর্থযাত্রী ছাড়াও বহু বৌদ্ধ এবং তিব্বতী এই তীর্থে আসেন। আপন ধর্মীয় রীতিতে দেবতার পূজা দিয়ে মহাশান্তি লাভ করেন।

হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের এহেন মধুর সহাবস্থান সমগ্র নেপাল ভূখণ্ডে বিরাজমান। কি ধর্মীয় আচরণে, কি জীবন যাত্রায়, কোন গোঁড়ামী প্রশ্রয় পায় না। দুটি স্রোতের উৎস আলাদা হলেও তাদের গতিপথ কিন্তু একই দিকে। যেন গঙ্গা যমুনার ধারা সঙ্গমে পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে বয়ে চলেছে জীবের কল্যানে, অমৃতময় মহাশান্তির পানে।

আমি ভারতীয় হিন্দু চলেছি ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালে। সেখানে রয়েছে আমার প্রাণের ঠাকুর। যাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমি যাত্রা শুরু করেছি। তেমনি হাজার হাজার বৌদ্ধও এ পথে তাঁর

ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে চলে। কারো কোন দ্বিধা নেই, নেই কোন অনুশাসনের দ্বন্দ্ব। যেন আনন্দময় অমৃত কুম্ভের দিকে সকলে এগিয়ে চলেছে। হিন্দু বৌদ্ধ যেন গঙ্গা যমুনা। সঙ্গমে মিলে মিশে একাকার। সঙ্গমের প্রবাহ পূতঃ পবিত্র। কল্যাণময়ী মুক্তি দায়িনী তীর্থবারি।

এ হেন এক মহাসঙ্গমের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। সেই প্রয়াগতীর্থে। প্রেম ও ভক্তির প্রবাহে সমস্ত দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা বিসর্জন দিয়ে লাভ করব প্রগাঢ় শান্তি, চরম আনন্দ।

মহাশান্তির জনক ভগবান বুদ্ধ। তাঁর জন্মভূমি এই নেপাল। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে লুম্বিনী গ্রামে ছায়াঘেরা শান্ত পরিবেশে তাঁর জন্ম। মহাশান্তির জনকের প্রভাবেই হয়ত সমগ্র নেপালের প্রকৃতিতে রয়েছে এক মোহময় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। অবশ্য হিমালয়ের প্রকৃতিগত স্বর্গীয় প্রভাব ও একই সঙ্গে প্রতিফলিত।

প্রকৃতির লীলাভূমি হিমালয়। হিমালয়ের কোলে লালিত নেপালের গায়েও তাই প্রকৃতির শতসহস্র লীলারেণু। যেন রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হিমালয় দুহিতা। উচ্ছল উজ্জল। নৃত্য চপল সঙ্গীতমুখর যেন এক পাহাড়ী ঝরণা।

এই রূপসীর আকর্ষণও কম নয়। দেবতার ডাকে ভক্তজন ছুটে যায় পশুপতি নাথ কিম্বা মুক্তিনাথ দর্শনে। রূপসীর মোহময় হাতছানিতে ও হাজার যাত্রী ছুটে যায়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বিরাম বিহীন। শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকেই নয়, সারা পৃথিবীর ভ্রমণবিলাসী মানুষ ছুটির অবকাশে নেপালে ছুটে আসে। বিশেষতঃ যারা ট্রেকিং ভালবাসে তাদের কাছে নেপাল আসার আনন্দ অপরিসীম।

নেপালের মত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও হিমালয়ের কোলে। কিন্তু ট্রেকিং-এর সুযোগ-সুবিধা তেমন নেই। যা-ও বা আছে বিদেশী পর্যটকদের কাছে মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

নেপালে কিন্তু ভিন্ন অবস্থা। একমাত্র পর্যটকদের কথা ভেবেই সেখানে সরকারী বেসরকারী বহু উদ্যোগ এগিয়ে চলেছে। অনেক

দুর্গম হাঁটাপথে দেখেছি যেখানেই গ্রাম রয়েছে, পথের ধারে অনেক বাড়ীতেই পর্যটকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, চাইনীজ ইংলিশ মোগলাই খাবার, মায় ডানলপিলোর বিছানা। চার্জও তেমন একটা বেশী নয়। অন্ততঃ দুর্গমতার তুলনায়। অবশ্য আরো একটা সুবিধা এখানে রয়েছে। সারা পৃথিবীর জিনিষ এখানে পাওয়া যাবে। অনেকটা হংকং এর মত। তাই বিদেশী পর্যটকদের কাছে নেপাল স্বর্গভূমি।

সর্বত্র সুব্যবস্থার মূলেও পর্যটকদের ভীড়। এই পর্যটকদের মাধ্যমেই নেপাল সরকারের মোটা টাকা আয়।

প্রকৃতি প্রেমিক ভ্রমণবিলাসী ছাড়া তীর্থযাত্রীর আগমনও নেহাৎ কম নয়। ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি নেপাল, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান। তাই প্রতি বছর চীন জাপান কোরিয়া থাইল্যাণ্ড বার্মা প্রভৃতি দেশ থেকে অগণিত যাত্রী তথাগতের পুণ্য জন্মভূমিতে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আমারও এ যাত্রা অনেকটা তীর্থযাত্রা। নেপাল-হিমালয়ের আকর্ষণও যে নেই তা নয়। তবে প্রধান আকর্ষণ মুক্তিনাথ। বিগত কয়েক বছর ধরে এ সঙ্কল্প পোষণ করে এসেছি। প্রতিবছর কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। এ বছর গোড়া থেকেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেপ্টেম্বরে যেমন করে হোক যাবই। তাছাড়া বয়সও ক্রমশঃ গড়িয়ে চলেছে। শরীর আজকাল মাঝে মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অতএব আর দেরী নয়।

এই যাত্রায় বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েছি অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধেয় কিরণদার কাছে। তিনি শুধু নিজে হিমালয় প্রেমিক নন। অন্যের মধ্যে এই প্রেম রস সঞ্চারিত করতেও বিশেষ পটু। তাঁরি প্রেরণায় তাঁর পুত্র মিলন দাস এবং বন্ধুবর শ্রীসুশীল রায়চৌধুরী এবং প্রবোধ ভট্টাচার্য হালে মুক্তিনাথ ঘুরে এসেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং সরস বিবরণ শুনে আমার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। সমস্ত চিন্তা

ভাবনা পিছনে ফেলে সপরিবারে বেরিয়ে পড়লাম।

সঙ্গীও জুটে গেল। অতীতে বহু পথের সাথী বন্ধু লক্ষ্মী নারায়ণ দাস। বন্ধু বিজয় দত্ত ও যাবে ঠিক ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যাত্রার দু'দিন আগে মেয়ের অসুস্থতার দরুণ যাওয়া হ'ল না।

॥ দুই ॥

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ সাল। নর্থ বিহার এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। গাড়ীটার যথেষ্ট বদনাম আছে। প্রথমতঃ সময়মত চলাফেরায় অরুচি। দ্বিতীয়তঃ এ পথের স্বাধীনচেতা যাত্রীরা রিজার্ভেসানের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাধা নিষেধ মানতে চায় না। অবশ্য এহেন সাহসিকতা আজকাল অন্যান্য শাখায়ও দেখা যায়। তৃতীয়তঃ যেটা সবচেয়ে দুশ্চিন্তার সেটা হচ্ছে চোর ডাকাতের উৎপাত। যখন তখন যেখানে সেখানে গাড়ী হোঁচট খেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবগতিক দেখলে মনে হয় ড্রাইভার কিম্বা গার্ডের ভূমিকায় তাদের দলের লোকই রয়েছে। যাই হোক, মুক্তিনাথের শরণ নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলাম। ভয় কি! একটা রাত বৈ তো নয়। ভোরবেলায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব।

সমস্ত ধ্যানধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে গাড়ী ঠিক সময়ে মুজফফর-পুর পৌঁছলো। পথে কোন রকমের ঝঞ্ঝাট পোহাতে হ'ল না। যাত্রার শুভ সূচনায় সকলেই খুশী।

প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে সবাই ফ্রেশ হয়ে নিলাম। লাগোয়া রিফ্রেসমেণ্ট রুমে চা পর্ব সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম।

ষ্টেশন থেকে বাসষ্ট্যাণ্ড খুব কাছেই। সাইকেল রিকসা করেই চলে এলাম।

এখান থেকে বাসে রক্সৌল ১৬৬ কিলোমিটার। প্রতি আধঘণ্টা

অন্তর ডিলাক্স বাস ছাড়ে। ভাড়া মাথা পিছু ১২ টাকা। অবশ্যই ঐ সময়ের হিসেবে। কারণ তেলের কৌলিন্যে ভাড়ার উর্দ্ধগতি সময়ের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখা যাচ্ছে না! নিত্য নতুন পাখা গজাচ্ছে, আর উড়ে উড়ে চলেছে।

বিকেল চারটে নাগাদ রক্সৌল পৌঁছে গেলাম। পৌঁছোতে সাড়ে চার ঘণ্টা লাগল।

রক্সৌল বেশ বড় জায়গা। ব্যবসাকেন্দ্র ও বটে। তাছাড়া সীমান্ত শহর। নেপালের একটা বিরাট অংশের সঙ্গে এ পথের যোগাযোগ। তাই শহরটা ছোট হলেও বেশ জমজমাট। দোকানপাট হোটেল রেঁস্তোরার ছড়াছড়ি।

একবার ভাবলাম রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরবেলা সীমান্ত পেরিয়ে বীরগঞ্জ পৌঁছোলেই চলবে। বীরগঞ্জ থেকে কাঠমাণ্ডুর প্রথম বাস ছাড়বে সকাল ৬৷৷/৭টায়। সকাল ৯টা পর্যন্ত আধঘণ্টা পরপর বাস ছাড়ে। কিন্তু দেখলাম সঙ্গীদের প্রায় সকলের ইচ্ছা এক্ষুনি বর্ডার ক্রস করে বীরগঞ্জ চলে যাওয়া। কেননা বর্ডারের উভয় দিকে চেকিং এর ঝামেলাটা তাহলে আজই শেষ হয়ে যায়।

যুক্তিটা অবশ্য মন্দ নয়। কাল সকালে আর কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। ঝাড়া হাত পা রওনা করা যাবে।

কয়েক খানা রিকসা নিয়ে উঠে বসলাম। ভাড়া প্রতিটি আড়াই টাকা। বীরগঞ্জে হোটেলে পৌঁছে দেবে। দূরত্ব মোট ৩½।৪ কিঃ মিঃ।

চেকিং-এ নামমাত্র ঝামেলা পোহাতে হ'ল। আধঘণ্টার মধ্যে সব কাজ সেরে বীরগঞ্জ অশোকা হোটেলে চলে এলাম। বাস ষ্ট্যাণ্ডের লাগোয়া বলেই এ হোটেলটা বেছে নিলাম। ছোট বড় অনেক হোটেলই রয়েছে দেখলাম। রক্সৌলের মত বীরগঞ্জও নেপালের সীমান্ত শহর। বহুদূরব্যাপী পশ্চাদ্‌ভূমি নিয়ে নেপাল ও ভারতকে এপথে ব্যবসা-বাণিজ্য, আদানপ্রদান চালাতে হয়। তাই বীরগঞ্জ ও রক্সৌলের মত কর্মচঞ্চল।

॥ তিন ॥

নেপাল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকে স্মৃতিপটে ভেসে উঠল রোমাঞ্চকর এক সুদূর অতীত। যেটা নেপালের সম্পূর্ণ নিজস্ব। উত্থানপতন ভাঙ্গাগড়ার অতীত আত্ম কাহিনী।

ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি এই নেপালের আরো একটা মধুর পরিচয় আছে। জনক নন্দিনী সীতার জন্মভূমি। একদিকে বুদ্ধদেব অন্যদিকে রামায়ণের প্রাণপ্রতিমা সীতা, এই দুই আশীর্বাদের মিলিত ধারা নেপালের জনজীবনে একটা মধুর তন্ময়তা এনে দিয়েছে। তাই নেপালে কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে কোন পথে বিশ্বাসী সেটা কোন সমস্যাই নয়। উভয়ে উভয়ের পথ এবং মত কে অতি সহজে আপন করে নিয়েছে।

নেপালের ইতিহাস খৃষ্টপূর্ব প্রায় হাজার বছর আগের। মহা ভারতে যে কিরাত সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে তারাই নাকি নেপালের আদি বংশধর এবং প্রশাসক। এই বংশের শ্রেষ্ঠ দুই নরপতির নাম ইলাম্বর এবং স্থুঙ্কু। তাঁদের প্রচেষ্টায় নেপালে সর্বপ্রথম হিন্দু দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার সুরু হয়। কিরাতদের আধিপত্য শুধু নেপালেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিমালয়ের সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলেই ছিল তাদের বসতি এবং রাজ্যসীমা। আজো তাদের বংশধররা নেপাল সহ সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নেওয়ার, লিম্বু প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে। তাদের শাখা প্রশাখা আজো মণিপুর নাগাল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কিরাতদের পর নেপালে জন্ম গ্রহণ করলেন ভগবান বুদ্ধ। খৃষ্ট জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর রাজা ছিলেন শুদ্ধোধন। তাঁর পত্নী মায়া দেবী ছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা। তাঁদেরই সন্তান এই গৌতম বুদ্ধ।

কিরাত রাজ বংশের পর নেপালে প্রতিষ্ঠিত হ'ল লিচ্ছবি রাজ বংশ। দীর্ঘ দিন ধরে রাজত্ব চালায়। যতদূর জানা যায় প্রায় হাজার বছর ধরে তাঁরা নেপালের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। লিচ্ছবি রাজ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি মানাদেব এবং অংশুবর্মার রাজত্বকালে নেপালের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটেছিল। বিশেষতঃ অংশুবর্মার রাজত্বকালে নেপালে এক ধর্মীয় জাগরণ ঘটে।

রাজা অংশুবর্মা ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। তাঁর পূর্বপুরুষরা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে নেপালে এসেছিলেন। তাই মনে হয় তিনি ভারতীয় আর্য-বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন উদার এবং স্নেহশীল রাজা। তিনি নিজে শিবের উপাসক হলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। প্রজাদের ধর্মীয় আচরনে তিনি কখনো কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করেন নি।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় তাঁর রাজত্বকালে বহু চৈনিক, বৌদ্ধ পরিব্রাজক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নেপালে আসেন। তাঁরা প্রত্যেকেই রাজা অংশুবর্মার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

পিতার উদার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে অংশুবর্মার কন্যা তিব্বত-রাজমহিষী ভ্রিকুটি সমগ্র তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু করেন। হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে এসকল তথ্য জানা যায়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নেপালের শাসন ক্ষমতায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল! অংশুবর্মার পর উচ্চবর্ণের হিন্দু রাজারা ক্রমশঃ দুর্বল এবং বিলাসী হয়ে উঠেন। পূর্ব পুরুষের মত রাজ্য শাসনের প্রতিভা এবং দক্ষতা তাঁদের আর ছিল না। এহেন এক সঙ্কটময় মুহূর্তে একদল রণনিপুন সাহসী সঙ্গী নিয়ে অভয়মল্ল নেপালে এসে উপস্থিত। তিনি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছিলেন।

অতি সহজেই নেপালরাজকে পরাজিত করে তিনি নেপালে মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মল্ল রাজাদের আগমণে নেপালে নবযুগের সূচনা হল। তবে প্রথম প্রথম মল্লরাজাদের অনেক বিদ্রোহের সম্মুখীন

হতে হয়েছে। প্রাক্তন রাজ অনুচর এবং বর্ণ হিন্দুরা প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করত। সুযোগ পেলে ধ্বংসাত্মক কাজেও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু মল্ল রাজারা কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ চূর্ণ করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মল্লরাজাদের মধ্যে আনন্দ মল্ল, জয়স্থিতি মল্ল, ভূপতিন্দ্র নাথ মল্ল এবং সিদ্ধিনরসিংহ মল্ল ছিলেন একাধারে দক্ষ প্রশাসক প্রজা-বৎসল এবং শিল্পানুরাগী। কারুকার্য মণ্ডিত অসংখ্য প্রাসাদ, দেব দেবীর মন্দির এবং বৌদ্ধ বিহার আজো তাঁদের কীর্তির সাক্ষ্য নিয়ে বর্তমান।

মল্ল রাজাদের রাজত্বের শেষভাগে আবার নেপালে নেমে আসে চরম অস্থিরতা এবং অরাজকতা। ঠিক সে সময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে খিলজী সম্রাট আলাউদ্দীন রাজপুতদের উপর চরম আঘাত হানেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদল রাজপুত বীর মাতৃভূমি ছেড়ে নেপালে এসে আশ্রয় নেন। তাঁরা ক্রমশঃ বংশ পরম্পরায় নেপালে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘকাল ধরে বাস করার দরুণ তাঁদের পরবর্তী বংশধররা নেপালের জীবনধারার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে ওঠে।

দীর্ঘদিন সহজ শান্ত জীবনধারণের পর তাঁদের সুপ্ত রাজপুত শৌর্য আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। দিগ্বিজয় এবং রাজ্যশাসনের নেশায় মত্ত হয়ে তাঁরা তাঁদের নির্বাচিত রাজা 'পৃথ্বিনারায়ণের পতাকাতলে সমবেত হন।

পৃথ্বিনারায়ণ সাহসী যোদ্ধা। তাছাড়া নেপালের ভৌগলিক প্রকৃতি তাঁর নখদর্পণে! তিনি বীর বিক্রমে সমস্ত রাজশক্তিকে পরাভূত করে প্রায় সমগ্র নেপাল অধিকার করে নেন! তাঁর সাহসী বীর সৈন্যদের বলা হত গুর্খা।

এই গুর্খা সৈন্য নিয়ে তিনি শুধু মল্ল রাজাদের পরাভূত করেন নি, দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যকেও বহুবার নাজেহাল করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরপর যুদ্ধজয়ে তাঁর জয়লিপ্সা বেড়ে যায়। এবার তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতভূমিতে আক্রমণ চালান এবং ক্রমে ক্রমে সিকিম ভূটান

গাড়োয়াল হিমাচল এবং তিব্বতের অংশ বিশেষ অধিকার করে নেন।

পৃথ্বিনারায়ণের এই রাজ্য লিপ্সা ইংরাজদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলল। পার্বত্য পরিবেশে গুর্খাদের সঙ্গে ইংরেজরা কিছুতেই পেরে উঠছিল না। অবশেষে যুদ্ধ বিশারদ জেনারেল অকটারলোনী উন্নত সমরাস্ত্র নিয়ে কাঠমাণ্ডু অভিযান করেন। এই অভিযান গুর্খারা কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারল না। পরাজয় মেনে নিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে হল।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দ, সাগৌলীতে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে উভয় পক্ষের বৈঠক বসল। নেপালের মূল ভূ-খণ্ড ছাড়া বিজিত অঞ্চলগুলি ইংরেজদের ফিরিয়ে দিতে হ'ল। শুধু তাই নয়, কাঠমাণ্ডুতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্টকে রাখতে বাধ্য হল।

নেপাল অভিযানের এই সাফল্যকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য ইংরেজরা কলকাতায় স্থাপন করল এক কীর্তিসৌধ যার পরিচিতি—
—মনুমেণ্ট, অকটারলোনী মনুমেণ্ট!

পৃথ্বিনারায়ণ নেপালের সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থার জনক। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা উত্তর কালে নেপালকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর পরবর্তী রাজাগণ ছিলেন অকর্মণ্য, বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। রাজশক্তির এহেন চরম দুর্দিনে এক সাহসী দক্ষ প্রশাসকের আবির্ভাব ঘটল। তাঁর নাম সমসের জঙ্গবাহাদুর রাণা। তিনি ছিলেন রাজার মুখ্যমন্ত্রী। যেমন ছিল তাঁর অসীম সাহস তেমন ছিল প্রচণ্ড বাহুবল। কূটনীতিতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি রাজ পরিবারের বিভিন্ন শরিকের ক্ষমতালিপ্সার চক্রান্তকে জনসমক্ষে ফাঁস করে দেন। তাঁরই প্ররোচনায় বৃটিশ কাউন্সিল রাজা ও রাণীকে ভারতবর্ষে নির্বাসনে পাঠান।

বহু বছর বাদে রাজা আবার দেশে ফিরে এলেন বটে কিন্তু কার্যতঃ গৃহবন্দীই হয়ে রইলেন। প্রজা শাসনে রাজার কোন অধিকার নেই। যা কিছু ক্ষমতা সবই মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে।

প্রধান মন্ত্রীই দেশের ভাগ্য বিধাতা। তিনিই মহারাজা। ক্রমে এই 'মহারাজা' পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠা পেতে লাগল।

যাই হোক পরবর্তী মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গবাহাদুর অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে নেপালে নব যুগের সূচনা করেন। নতুন পথঘাট নির্মাণ করে দেশের দুর্গম প্রান্তে যাতায়াতের পথকে তিনি সুগম করে তুলেন। রাজকর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ প্রথা নির্মূল করেন। প্রচলিত দাস প্রথাকে কঠোর আইনের মাধ্যমে তিনি রহিত করেন। দেশে চুরি ডাকাতি বন্ধ করে তিনি জনগণের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করতে সক্ষম হন। নেপালকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টায় তিনি বহুবিধ শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁরি উদ্যোগে নেপালে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক সরবরাহ কেন্দ্র এবং উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এককথায় এই চন্দ্র সমসের রাণা নেপালের শেষ সার্থক মহারাজা।

পরবর্তীকালে আরো চারজন মহারাজা রাজত্ব করেছেন। তাঁরা শুধু নামেই মহারাজা। নির্গুণ।

তবে একটা ব্যাপারে সকল মহারাজাই সচেষ্ট থাকতেন যাতে করে ভারতের বৃটিশ সরকারকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। তাই সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পর্যন্ত যুদ্ধ নিপুণ গুর্খা সৈন্যরা বৃটিশ স্বার্থে লড়াই করে গেছে। প্রতিদানে বৃটিশ সরকারও প্রচুর অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং সমরাস্ত্র দিয়ে নেপালকে সাহায্য করে।

দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে রাণা বংশের লোকেরা প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়। তাই স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। স্বার্থের এই সংঘাত রাণা পরিবারের ভিত নাড়িয়ে দিল। প্রজারাও প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। প্রজাদের অসন্তোষের মূল কারণ হ'ল তখন বর্হিবিশ্বে স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্র প্রেমিক মানুষের অভ্যুত্থান ঘটেছে। প্রতিবেশী ভারতবর্ষেও

ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম চরমে পৌঁছেছে। ভারতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে নেপালীরাও নেপাল কংগ্রেস গঠন করে ফেলল। তারপর শুরু হ'ল অসহযোগ। দলে দলে নেপালী যুবকেরা আইন অমান্য এবং কারাবরণ করতে লাগল।

এ হেন সঙ্কটময় মুহূর্তে নেপালের শাসন ব্যবস্থায় একটা অঘটন ঘটে গেল।

রাজ্য শাসনে রাণাবংশের রাজার কোন মূখ্য ভূমিকা ছিল না। এমনকি স্বাধীন ভাবে কোন কিছু করার বিন্দুমাত্র সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত। কার্যতঃ তিনি ছিলেন রাজকীয় কারাগারে বন্দী।

বহু বছর ধরে এরকম অসহায় কারাজীবনে অতিষ্ঠ হয়ে রাজা ত্রিভুবন আচমকা এক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি একদিন রাতের অন্ধকারে সপরিবারে ভারতীয় দূতাবাসে এসে হাজির হলেন। সলাপরামর্শ বোধহয় আগে থেকেই চলছিল। যাইহোক তিনি সপরিবারে দূতাবাস মারফৎ পালিয়ে এলেন সোজা দিল্লীতে। ভারতের তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনায় নেপালীদের বৈপ্লবিক চেতনা বেড়ে গেল। ভারতের নৈতিক সমর্থন ও তারা আদায় করে নিল।

নেপালীরা দলে দলে নেপালী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল। শুরু হল গণ অভুত্থান। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমনকি সৈন্যদলেও রাজা ত্রিভুবনের সমর্থকরা দিন দিন বেড়ে চলল। কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র নেপালে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল।

অনন্যোপায় রাণাশাসক আপোষ মীমাংসার পথ খুঁজতে লাগলেন।

সুযোগও এসে গেল। নেহেরুর চেষ্টায় রাণাশাহী এবং রাজা ত্রিভুবনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক বসল দিল্লীতে। বৈঠকে যুক্তিতর্ক বাদানুবাদের ঝড় বয়ে গেল। অবশেষে সমস্যার সমাধান মিলল। রাণাশাহী শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটল।

রাজা ত্রিভুবন কাঠমাণ্ডু ফিরে এসে নতুন অস্থায়ী সরকার ঘোষণা

করলেন। সরকারের কাঠামো সম্পুর্ণ গণতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত হল। এই সরকারে সদস্য সংখ্যা মোট দশজন। রাজা নিজে এবং তাঁর মনোনীত অন্য চারজন। বাকী পাঁচজন সদস্য মনোনীত হলেন রাণা পরিবার থেকে। সদস্যদের মধ্যে রাজাই অবশ্য সর্বপ্রধান।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাণা পরিবারের সমশের জঙ্গবাহাদুর রাণা এই অস্থায়ী সরকারে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

এই শাসন ব্যবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। অসন্তোষের পরিধি ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলল। অবশেষে নেপালের প্রধান মন্ত্রী সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা রাজ্য ও রাজত্ব থেকে ভারতবর্ষে নির্বাসিত হলেন। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজা ত্রিভূবনও অল্পকালের মধ্যে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৯ বৎসর।

রাজা ত্রিভুবনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ৩৪ বৎসর বয়স্ক যুবরাজ মহেন্দ্র বীর বিক্রম সাহদেব নেপালের রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

প্রথমেই তিনি আভ্যন্তরিণ শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তারপর বিশ্বের দরবারে তিনি নেপালকে হাজির করলেন। তাঁরি প্রচেষ্টায় নেপাল জাতিসঙ্ঘের সদস্য নির্বাচিত হ'ল। তাছাড়া যেসব দেশের সঙ্গে অতীতে নেপালের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না যেমন, রাশিয়া, চীন, ইটালী ইত্যাদি, সে সকল দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল।

সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নেপালে নবযুগের সূচনা করেন।

নির্বাচনে নেপাল কংগ্রেস জয়লাভ করে এবং প্রথম সারির নেতা বি পি কৈরালা প্রধান মন্ত্রী মনোনীত হন।

রাজা মহেন্দ্রের নেতৃত্বে সমগ্র নেপালে শুরু হল এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। রাস্তা ঘাট, ব্রীজ, কারখানা, জল বিদ্যুৎ প্রকল্প সব কিছু সমান তালে এগিয়ে চলল। বিদেশী সাহায্যও আসতে লাগল প্রচুর।

এসময় বিনা মেঘে বজ্রপাত হ'ল। নেপালের ভাগ্যাকাশে নেমে

এল দুশ্চিন্তার ছায়া। বিরাম বিহীন কর্মযজ্ঞের হোতা নেপালের প্রাণপুরুষ রাজা মহেন্দ্র হঠাৎ পরলোক গমন করলেন।

এই বিরাট শূণ্যতার মধ্যেও নেপালের প্রগতির কর্মযজ্ঞ থেমে রইল না। তাঁর আরব্ধ কার্য দৃঢ়তার সঙ্গে সফল করার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র যুবরাজ বীরেন্দ্র। কিছুদিনের মধ্যে পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেব।

এই হ'ল নেপালের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস। ইতিহাস জাতির গৌরব। তার প্রাণসত্ত্বা। জাতির শৌর্য বীর্য জ্ঞান গরিমা সব কিছুর প্রেরণা আসে যে জাতির ইতিহাস থেকে। তাই নেপালকে জানতে হলে, নেপালের ধর্ম্ম কর্মের প্রেরণাকে উপলব্ধি করতে হলে, তার ইতিহাস কিছুটা সাহায্য করবে বৈকি!

॥ চার ॥

বীরগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে কিছুটা প্রায় সমতল রাস্তা। হাতোরা পর্যন্ত। তারপর অল্পবিস্তর চড়াই পথের সুরু। হাতোরা থেকে ভইসে। তারপর শিকারকোট। শিকারকোট বেশ বড় উপত্যক। জন বসতিও সেরকম। দু'চারটা কল কারখানার উদ্যোগ পর্ব সুরু হয়েছে দেখলাম।

এবার পথ রীতিমত পাহাড়ী রূপ নিয়েছে। এঁকে বেঁকে চড়াই উতরাই পেরিয়ে। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়, অন্যদিকে গভীর গিরিখাদ। তবে রাস্তা হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় প্রশস্ত। তদারকীর ব্যবস্থাও ভাল মনে হ'ল।

বীরগঞ্জ থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত, পথের দূরত্ব ১৯৬ কিঃ মিঃ। এ পথের নাম ত্রিভুবন রাজপথ।

বেশীদিনের কথা নয়, আজ থেকে মাত্র পঁচিশ বছর আগে এই

পথে ভারত নেপাল যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে। ভারতীয় সহযোগীতায় তৈরী এই রাজপথ সত্যিই রাজপথ। যেমন প্রশস্ত তেমন মজবুত বাঁধানো। সঙ্গে যোগ হয়েছে নেপাল হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য গরিমা। যেন এক বিরাট অজগর সাপ পাহাড়ের গা কেটে স্থায়ীভাবে জড়িয়ে আছে।

রূপময় হিমালয়ের রত্ন ভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। পথের দু'পাশে বর্ণালী রূপচিত্র। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সবুজ শস্যক্ষেত্র। নীচে বয়ে চলেছে কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী। নৃত্যচপল ছন্দে দুই পাহাড়ের খাঁজে দুরন্ত গতিতে। আবার কোথাও উর্বশী ঝরণা নৃত্য-গীতের উদ্দাম মাদকতায় পাহাড়ের গা বেয়ে কলস্বরে নেমে আসছে। কোথাও বা বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে সারি সারি ঘরবাড়ী। আঁকা-বাঁকা পথ মিশে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সব কিছুর উর্দ্ধে নীল আকাশ। প্রান্তরেখায় যেন দশানন স্থির দাঁড়িয়ে। মাথায় সারি সারি তুষার—উষ্ণীষ। সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল। যেন ধাতব শুভ্র রংমশাল।

হঠাৎ বাসটা চড়াই পথে মোড় নিল। বেশ খানিকটা টানা চড়াই। অবশেষে চড়াই পথের অবসান ঘটল এক সু-উচ্চ গিরি উপত্যকায় পৌঁছে। এখানে কিছুক্ষণের বিরতি। জায়গাটার নাম দামন। উচ্চতা প্রায় পৌনে আট হাজার ফুট। এখান থেকে হিমালয়ের অনেক বিখ্যাত তুষার শিখর দেখা যায়। অনেকটা কুমায়ুন রেঞ্জের কৌসানীর মত। কৌসানীর দৃশ্যমান পরিধি অবশ্য এর থেকেও বেশী। সেখানেও নামকরা শিখরগুলি যথা নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল ইত্যাদি গিরিশৃঙ্গ, মনে হয় যেন হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। এখানেও দেখলাম অনেকটা সেরকম। এখানেও অন্নপূর্ণা, ধৌলাগিরি, মচ্ছপুছারে, ল্যাংট্যাং হিমল, লোৎসে, মাকালু এমন কি এভারেষ্ট শৃঙ্গ ও দৃষ্টি সীমার মধ্যে। এখানকার আধুনিক আরামদায়ক ট্যুরিষ্ট বাংলো ক্রমবর্ধমান যাত্রীসমাগমের কথা ভেবেই তৈরী করা হয়েছে।

আমাদের অবশ্য ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। পূর্বব্যবস্থা ছাড়া

এখানে জায়গা পাওয়া দুষ্কর। খবর নিয়ে জানলাম 'হাউসফুল'। যাক্‌গে, পথে আরো অনেক নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করতে পারব। আমরা মুক্তিনাথের যাত্রী। শুনেছি মুক্তিনাথের পথে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির অফুরন্ত রত্ন সম্ভার। অতএব চল এগিয়ে চল অমৃতময় মুক্তির সেইপথে মুক্তিনাথে।

টানা উৎরাই পথে বাস ছুটে চলেছে প্রশস্ত উপত্যকার বুক চিরে। মনেই হয় না সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ ছ হাজার ফুট উঁচুতে পার্বত্যপথে আমরা এগিয়ে চলেছি। ক্রমশঃ উপত্যকার প্রশস্ততা বাড়ে। বুঝতে পারি কাঠমাণ্ডু উপত্যকা আর বেশী দুরে নয়।

॥ পাঁচ ॥

অবশেষে বিকেল তিনটে নাগাদ কাঠমাণ্ডু পৌঁছে গেলাম। শহরের অভ্যন্তরে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে যাত্রা শেষ।

কাঠমাণ্ডুর অপর নাম কান্তিপুর। আবার অনেকের মতে কাঠমাণ্ডু কথাটার উৎপত্তি 'কাষ্ঠ মণ্ডপ' থেকে। মল্লরাজ নরসিংহ ষোড়শ খৃষ্টাব্দের শেষ দশকে এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্মিত মণ্ডপ তৈরী করান। কথিত আছে আস্ত একখণ্ড কাঠ থেকেই এই মণ্ডপ সম্পূর্ণ হয়েছিল। মণ্ডপগৃহটি দেখতে অনেকটা প্যাগোডার মত। দরবার স্কোয়ারের সন্নিকটে আজো তা দর্শনীয় আকর্ষণ।

ভূতত্ত্ববিদের মতে কাঠমাণ্ডু উপত্যকাও নাকি এককালে কাশ্মীরের শ্রীনগর উপত্যকার মত ছিল বিরাট জলাশয়। কালের প্রবাহে জলের প্রবাহ শুকিয়ে ক্রমশঃ এক বিরাট সমতল উপত্যকায় রূপান্তরিত হয়। কাঠমাণ্ডু উপত্যকা প্রশস্ততায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। আয়তনে ২১৮ স্কোয়ার মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৪২৩ ফুট উঁচু। এই উপত্যকায় ছয় লক্ষ লোকের বাস।

কাঠমাণ্ডু শহরের পরিধি রাজা গুণকাম দেবের আমলেই বৃদ্ধি পায়। ৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র উপত্যকা জুড়ে নগর স্থাপনে প্রয়াসী হন।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকা প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত। কাঠমাণ্ডু, পাটন, ভাটগাঁও বা ভক্তপুর। তবে কাঠমাণ্ডুর ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আরো একটা ছোট্ট শহর রয়েছে, তার নাম কীর্তিপুর। তারো কলেবর দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এযাত্রা আমাদের মুক্তিনাথ দর্শনই প্রধান কাম্য। তবুও আর একবার পশুপতিনাথ দর্শনের ইচ্ছায় কাঠমাণ্ডু এসেছি। এসেই যখন পড়েছি তখন কাঠমাণ্ডুর চারদিকটা আর একবার ভাল করে দেখে নি। সহযাত্রীদের উৎসাহ দেখে নিজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল।

বিকালে পেঁাছে সন্ধ্যায় একবার পশুপতিনাথ দর্শন করে এলাম। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডাও বেশ। তাই আর বেশী ঘোরাঘুরি না করে সোজা হোটেলে এসে ঢুকলাম।

পরদিন ভোর হতেই ট্যাক্সি নিয়ে পাটন রওনা হলাম। বাগমতীর দক্ষিণতীরে কাঠমাণ্ডু থেকে ৫।৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণপূর্বে এ সহরের অবস্থান।

পাটনের আরেক নাম ললিতপুর। খৃষ্টজন্মের ২৯৮ বছর পরে রাজা বীর দেব এই সহর পত্তন করেন।

পাটনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। ঘর বাড়ী গম্বুজ দেবমন্দির সর্বত্র কারুশিল্পের লীলায়িত আস্তরণ। কালের বিরাট ব্যবধানেও শিল্পীর শিল্প সুষমা আজো জীবন্ত। সাধারণ গৃহস্থের ঘরবাড়ীর দরজা জানালা দেওয়ালেও সুক্ষ্ম কারুকার্যের ছাপ। তাই হয়ত স্বাভাবিক কারণেই বলা হয়—The City is Particularly noted for its craftmanship and thus it is also known by the name of Lalitpur—The City of Beauty and fine arts.

সহরের কেন্দ্রস্থলে দরবার স্কোয়ার। কয়েকটি প্রাচীন প্রাসাদ এবং দেবমন্দিরের সমষ্টি। মাঝখানে বিরাট চত্বর। পাশেই কৃষ্ণ-মন্দির। বিগ্রহের অবস্থান দোতলায়। মাঝখানে ভগবান কৃষ্ণ। একপাশে রাধা অন্যপাশে রুক্মিণী। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ সিদ্ধি নরসিংহ এই মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরগাত্রে খোদিত অসংখ্য পুরাণ কাহিনী আজো শিল্পসুষমায় ভাস্বর।

ললিত পাটনের আরেকটি মহৎ শিল্পকর্ম হ'ল হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার। এই ত্রিস্তর স্বুবর্ণ প্যাগোডা মন্দিরটি রাজা ভাস্কর বর্মা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন।

দরবার স্কোয়ার থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথে এক সরু গলির মধ্যে এই বৌদ্ধ বিহার। বিগ্রহ ভগবান বুদ্ধের স্বুবর্ণমূর্তি। চারিদিকে রয়েছে প্রার্থনা চক্র। চক্রের গায়ে আরাধনার মূলমন্ত্র—ওঁ মণি পদ্মে হুঁ। পুণ্যার্থীরা চক্রগুলি একের পর এক ঘুরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে ভগবান বুদ্ধের পায়ে সভক্তি আত্মসমর্পণ।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বুদ্ধ বিহারের কথা বলে রাখি। সেটা হ'ল রুদ্রবর্ণ মহাবিহার। এও একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। কারুকার্য-মণ্ডিত এই বিহারেও ভগবান বুদ্ধের অবস্থান। তা ছাড়া আছে ব্রোঞ্জ ও পাথরের বহু অনিন্দ্য সুন্দর মূর্তিও দৃশ্যাবলী।

রুদ্রবর্ণ মহাবিহার থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে আরো একটা শিল্প-কীর্তি। কুম্ভেশ্বর মন্দির। বিগ্রহ দেবাদিদেব মহাদেব। রাজা জয়স্থিতিমল্ল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি পাঁচতলা। প্যাগোডা-কৃতি। জননীপূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে।

ললিতপুরের ললিতকলায় মনে বিস্ময় জাগে। পরম উৎসাহে দেখে চলি একের পর এক শিল্পকীর্তি।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় চলে এলাম বাগমতী তীরে। ভগবান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জগৎ নারায়ণ মন্দিরে। মন্দির মধ্যে পাথর ও ধাতু-নির্মিত বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তি।

পাটন পরিক্রমায় সবশেষে উপস্থিত হলাম মচ্ছেন্দ্রনাথ মন্দিরে। "রক্তবর্ণ মচ্ছেন্দ্রনাথ"। মন্দিরটির নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে। এই মন্দিরটিও প্যাগোডাকৃতি। চতুষ্কোণ।

মচ্ছেন্দ্রনাথ, রক্তবর্ণ মচ্ছেন্দ্রনাথ যাঁর অপরনাম অবলোকিতেশ্বর, এই মন্দিরে বছরে মাত্র ছ'মাস অবস্থান করেন। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস এই মচ্ছেন্দ্রনাথই পাটন উপত্যকার ত্রাণকর্তা।

ললিতপুর থেকে ফেরার পথে আরো একটা মন্দিরের নাম শুনলাম। সময়ের অভাবে সেখানে আর যাওয়া হ'লনা। মন্দিরটির নাম বজ্রবাহারী। দরবার স্কোয়ার থেকে ছ'মাইল দক্ষিণে। চাপাগাঁও গ্রামে।

পাটন থেকে ফেরার পথে একে একে সমস্ত মন্দির স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার আলোকে দেবতা এবং দেবালয় যেন একাকার। সৃষ্টির উৎকর্ষতায় যেন একে অন্যের পরিপূরক। সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারণা এই অপরিসীম সৌন্দর্যের মূল্যায়ন করতে অক্ষম।

যাইহোক পূর্ণ সুখস্মৃতি নিয়ে হোটেলে ফিরে আসি। খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যা থেকেই রাতের বিশ্রাম। কাল সকালের প্রোগ্রাম কাঠমাণ্ডু উপত্যকার আর এক রূপতীর্থ ভাটগাঁও বা ভক্তপুর।

॥ ছয় ॥

সকালবেলা ট্রলিবাসে রওনা হলাম। মাত্র আধঘণ্টার পথ। মাঝে কয়েকটা লিমিটেড স্টপেজ। বাস থেকে নেমে ৩।৪ মিনিটের হাঁটা পথে দরবার স্কোয়ার। ট্যাক্সি সোজা ভিতরে ঢুকে যায়।

ভাটগাঁও মধ্যযুগীয় শিল্পস্থাপত্যের প্রাণকেন্দ্র। প্রতিটি মন্দিরে শিল্প নৈপুণ্যের অপরূপ বিকাশ। ভাটগাঁও নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা আনন্দমল্ল। সময়কাল ৮৮৯ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য মতান্তরে ভাটগাঁওয়ের জন্ম নাকি আরো অতীতে। লিচ্ছবি রাজাদের আমলে।

ভাটগাঁওয়ের চারিদিক প্রাকার বেষ্টিত। প্রবেশ পথে আছে এক ঐতিহাসিক জলাশয়। নাম 'সিদ্ধ পোখরী'। রাজা যক্ষমল্লের রাজত্বকালে পুকুরটি খনন করা হয়।

ভাটগাঁও পাটনের তুলনায় অনেকটা ছিমছাম। পথঘাট ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত।

এই সহরের প্রাণকেন্দ্রও সেই দরবার স্কোয়ার। প্রাসাদ ও মন্দিরের সমষ্টি। যার প্রতিটি দরজা জানলা এবং দেওয়ালগাত্রে রয়েছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পের অগণিত নিদর্শন। সূক্ষ্ম কারুকার্যের চমকপ্রদ লীলা বৈচিত্র।

প্রধান ফটকের প্রবেশ পথে আছে শিল্পকীর্তির শ্রেষ্ঠ অবদান স্বর্ণ দরওজা। নির্মাতা রাজা রঞ্জিত মল্ল। মল্ল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ভূপতীন্দ্র মল্লের সুযোগ্য সন্তান। পিতৃ নির্মিত বিরাট প্রাসাদের উপযুক্ত স্বর্ণ তোরণ তিনি নির্মাণ করান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই তোরণের শিল্পোৎকর্ষ ভুবনবিদিত।

তোরণ দ্বারে গরুড়ারূঢ় মহামায়া। দুইপাশে স্বর্গের অপ্সরী। শীর্ষে সুবর্ণময় তিনটি ঘণ্টা। একটু নিচে জীবজন্তুর সুবর্ণ মূর্তি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ

বৎসর এই ভাটগাঁও বা ভক্তপুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব চালান। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ন্যাতাপোলা মন্দির। পাঁচতলা, প্যাগোডাকৃতি। প্রতি তলায় একজোড়া বিরাট মূর্তি। নিচের তলায় একজোড়া বীর যোদ্ধার মূর্তি। তার উপরের তলায় একজোড়া হাতি। তার উপরে একজোড়া সিংহ। তারপর একজোড়া বাঘিনী। সবশেষে একজোড়া দেবী অংশে সিংহী। নিচ থেকে ক্রমশঃ উপরের মূর্তিগুলি দশগুণ পরাক্রমশালীর প্রতীক। নিচের তলার শক্তিশালী দুই বীরের মূর্তি নাকি জয়মল্ল এবং পত্তমল্লের প্রতীক।

মন্দির সংলগ্ন রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথে স্বর্ণ দরজার মুখোমুখি রাজা ভূপতিন্দ্রনাথের স্ট্যাচু। স্তম্ভের উপর বন্দনারত সুবর্ণ মূর্তি।

দরবার স্কোয়ারের আর এক আকর্ষণ ভৈরব মন্দির। এই প্যাগোডা কৃতি মন্দিরটির প্রথম একতলা নির্মিত হয় রাজা জগৎজ্যোতি মল্লের রাজত্বকালে। পরে ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল মন্দিরটির তিনতলা সম্পূর্ণ করেন। রুদ্রভৈরবের এই মন্দিরটি সূক্ষ্ম কারুশিল্পের আধার।

এই ভৈরব মন্দিরের চেয়ে আরো প্রাচীন একটা শিব মন্দির আছে। নাম দত্তাত্রেয় মন্দির। একটা গাছের কাঠ দিয়েই নাকি মন্দিরটি তৈরী। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা যক্ষমল্ল। সময়কাল ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দ। পরবর্তীকালে রাজা বিশ্ব মল্ল মন্দিরটির সংস্কার সাধন করেন।

ভক্তপুর পরিক্রমার শেষ লগ্নে উপস্থিত হলাম সূর্যবিনায়ক মন্দিরে। ছায়াঘেরা আরণ্যক পরিবেশে মন্দিরটির অবস্থান। মন্দিরের বিগ্রহ সিদ্ধিদাতা গণেশ। দিবারম্ভে উদীয়মান সূর্যের রক্তিম রশ্মি সর্বপ্রথম এই মন্দিরে পতিত হয়। তাই এর নাম সূর্যবিনায়ক মন্দির।

দিনান্তে সিদ্ধিদাতাকে প্রণাম জানিয়ে ভক্তপুর পরিক্রমা শেষ করলাম।

আজ সারাদিনের শ্রমসাধনায় আমরা সিদ্ধিলাভ করেছি। ভক্তপুরের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে আজ জীবন্ত

হয়ে ধরা দিয়েছে।

স্থান বিশেষে এ ধরণের উপলব্ধি আমার আগেও বহুবার ঘটেছে। মৃত অতীত হঠাৎ যেন প্রগলভতায় মুখর হয়ে ওঠে। চিতোর, ফতেপুর সিক্রী, গোলকুণ্ডা ফোর্টে অবস্থান কালে বারে বারে উপলব্ধি করেছি অতীত ইতিহাসের বিশিষ্ট পাত্র-পাত্রীর জীবন্ত সান্নিধ্য। তারা যেন আমার আশে পাশেই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। এমনকি তাদের কথোপকথনের চাপা ধ্বনি কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

অনুরূপ উপলব্ধি এই ভক্ত পুরেও অনুভব করলাম। লিচ্ছবি, মল্ল, ঠাকুর বংশের গৌরব গাথা শত বেণুবীণারবে হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের এই রোমাঞ্চকর মূর্চ্ছনা স্নায়ুতন্ত্রীতে বহুদিন জাগ্রত থাকবে।

॥ সাত ॥

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার কথা বলতে গেলে প্রথমেই এর বিশাল পরিধির কথাই মনে পড়ে। সুউচ্চ হিমালয়ের বুকে এই উপত্যকা প্রশস্ততম। পাটন ভক্তপুর নিয়ে সমগ্র কাটমাণ্ডু উপত্যকার পরিধি ২১৪ স্কোয়ার মাইল। জনসংখ্যা ৬ লক্ষের উপর। উচ্চতা ৪৪২৩ ফুট। কাঠমাণ্ডুর আবহাওয়া বেশ মনোরম। এখানে প্রধানতঃ চারটি ঋতু প্রত্যক্ষ অনুভূত।

গ্রীষ্ম শরৎ শীত বসন্ত। জুন জুলাই আগষ্ট গ্রীষ্ম। সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর শরৎ। ডিসেম্বর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী শীত এবং মার্চ এপ্রিল মে বসন্তকাল। ঋতুর প্রভাব যাই থাক না কেন এখানে সারা বছর ধরে ট্যুরিষ্ট সমাগম ঘটে। কেউবা তীর্থের টানে, কেউবা প্রকৃতি প্রেমে, আবার কেউবা শিল্পকর্মের আকর্ষণে।

কাঠমাণ্ডু নেপালের রাজধানী। বেশ বড় শৈল শহর। এর গুরুত্ব বহুমুখী। এ যাত্রায় আমি তীর্থযাত্রী। তাই মন্দির শহর কাঠমাণ্ডুর রূপচিত্রই আমার প্রধান আকর্ষণ!

নেপাল রাজার দেশ। তাই প্রথমে রাজবাড়ী দর্শনে এগিয়ে গেলাম। প্রাচীন রাজবাড়ী। বর্তমান 'শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক রাজবাড়ী নয়।

প্রাচীন এই রাজবাড়ীর রূপকার রাজা মহেন্দ্রমল্ল। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্মাণ কার্য শুরু করেন। প্রায় ১০০ বছর ধরে নির্মাণকার্য চলতে থাকে। রাজা প্রতাপমল্ল আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করান।

প্রাচীন এই রাজবাড়ীর অবস্থান হনুমান চোকায়। এখানেই মল্ল রাজাদের সৃষ্টি দরবার-গৃহ। এই দরবার গৃহ বেশ কয়েকটি অট্টালিকা এবং মন্দিরের সমষ্টি। রাজবাড়ীটি বর্তমানে জাতীয় মিউজিয়াম। এখানেই রয়েছে মল্লরাজাদের কীর্তি তেলেজু ভবানী

মন্দির। মল্লরাজাদের কুলদেবতা। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ মহেন্দ্র মল্ল এই মন্দির নির্মাণ করান। এই মন্দিরের শিল্প বৈচিত্র এবং আড়ম্বর শোভা সত্যিই বিস্ময়কর। প্যাগোডাকৃতি সুউচ্চ এই মন্দিরের চূড়া সুবর্ণময় এবং তাতে রয়েছে সারিবদ্ধ অসংখ্য ঘণ্টা।

এই মন্দিরের অনতিদূরেই কুমারী মন্দির। দেবী কুমারী নেপালের জন-জীবনে পবিত্রতা এবং শৌর্যের প্রতীক। দেবী কুমারীর পূজা এখানকার বিশেষ অনুষ্ঠান। রাজ্যের পুরোহিত সম্প্রদায় বালিকাদের মধ্য থেকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একজনকে বাছাই করে নিয়ে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিবছর সুসজ্জিত রথে করে দেবীকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। প্রদক্ষিণ কালে অগণিত জনসাধারণ দেবীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ কামনা করে। নেপালের রাজা ও সে সময় দেবী পুজায় অংশ নেন এবং আশীর্বাদ কামনা করেন।

দরবার গৃহ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম স্বয়ম্ভুনাথ দর্শনে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। প্রায় দু'হাজার বছরের পুরনো। নেপালের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ।

কাঠমাণ্ডু শহরের দু মাইল পশ্চিমে আড়াইশফুট উঁচু এক পাহাড়ের মাথায় এই চৈত্যের অবস্থান। শেষ স্তরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

এই চৈত্যটির আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রাকার। সর্বোপরি স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া। চূড়ার নিচের অংশ চৌকো। চারদিকে চার জোড়া চোখ আঁকা। শুনলাম এই চোখ ভগবান বুদ্ধের বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা করুণা দৃষ্টির প্রতীক।

চৈত্যটির একপাশে রয়েছে পরবর্তী কালের আরেকটা বিহার। সেখানে ভগবান বুদ্ধের সুবর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্তির সামনে প্রশস্ত মেঝেয় দেখলাম ধ্যানরত কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষু। কয়েকজন'আবার শাস্ত্রপাঠ করে চলেছেন। শান্তির দূত ভগবান বুদ্ধের উপযুক্ত সাধনক্ষেত্র।

অন্যপাশে মা শীতলার মন্দির। সেটাও প্যাগোডাকৃতি। সর্ব-

ধর্মের মানুষের, বিশেষতঃ শিশুদের রোগমুক্তির দেবী তিনি।

এক জায়গায় স্তূপের গায়ে ছোট ছোট মূর্তি। জনৈক ভক্তের কথায় বুঝলাম জগন্মাতার বিভিন্ন রূপের কল্পকায়া। আশেপাশে আরো কিছু দেবদেবীর মূর্তি নজরে পড়ল। যথারীতি পূজার ব্যবস্থা রয়েছে দেখলাম। মনে মনে ভাবি কি আশ্চর্য দেশ এই নেপাল। একই চত্বরে দুই ভিন্ন ধর্মের কি সুন্দর সহাবস্থান। আচার আচরণের মধ্য দিয়ে অবশেষে ভগবৎ উপলব্ধির প্রেমময় সঙ্গমে নির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় স্রোত খুঁজে পাওয়া যায় না। নেপালের প্রায় সব মন্দিরেই ধর্মের এই শাশ্বত লীলামাহাত্ম্য বিরাজমান। এই স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরেও সেই একই ভাবধারার বিকাশ ঘটেছে। একদিকে ভগবান বুদ্ধের ত্রিতাপজ্বালাহারী করুণাঘন মূর্তি, অন্যদিকে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর বহুমুখী সর্বংসহা রূপ। এই যৌথ মহিমা নেপালের ধর্মীয় জীবনে সৃষ্টি করেছে একক প্রার্থনা সঙ্গীত।

নেপালের প্রধান তীর্থ পশুপতিনাথ। ভারতবাসী মাত্রেই নেপালে এলে পশুপতিনাথ দর্শন করবেই। কত শতবর্ষ পার হয়ে গেছে। নেপালের ইতিহাসে ঘটে গেছে কত পরিবর্তন। বাগমতীর বুকে বয়ে গেছে অজস্র প্রবাহ। কিন্তু পশুপতিনাথ দর্শনে পুণ্যসঞ্চয় আজো অব্যাহত।

শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে ৬।৭ কিঃ মিঃ দূরে বাগমতী তীরে এই মন্দিরের অবস্থান। বাস ট্যাক্সি যাতায়াত করে।

পশুপতিনাথ, মহেশ্বর, নেপালের জাতীয় জীবনের অধীশ্বর। তাই নেপালীদের কাছে পশুপতিনাথ দর্শন জীবনধারণের অঙ্গ।

ভোর হতেই আমরা পশুপতিনাথ দর্শনে রওনা হলাম। শহরের প্রান্তসীমায় নির্জন পরিবেশে মন্দিরের অবস্থান। তবে প্রবেশ পথে সারিসারি অসংখ্য দোকানপাট। তবে এত বড় তীর্থস্থানের তুলনায় ওসব কিছুই নয়।

পশুপতিনাথের মন্দিরটি দোতলা, প্যাগোডাকৃতি। স্বর্ণময় চূড়া, কারুকার্যখচিত তোরণ দ্বার। মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলে প্রথমেই

নজরে পড়বে এক বিশাল স্বর্ণময় বৃষমূর্তি। সমগ্র চত্বর পাথর বাঁধানো। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠেই মন্দিরের প্রধান দরজা। মন্দির প্রকোষ্ঠের চারদিকে চারটি দরজা। সব কটিই রৌপ্যময়। চারিদিকে শ্বেতপাথরের টানা বারান্দা। রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভক্তরা অনায়াসে সব কটি দরজা প্রদক্ষিণ করে পূজো দিতে পারেন। ভীড় সব সময় লেগেই আছে। পুণ্য তিথিতে বিশেষ করে শিব চতুর্দশীতে ভীড় যেন বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউ। তখন এখানে বিরাট মেলা বসে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হয়ে সারারাত্রব্যাপী শিবের মহিমা কীর্তন এবং শিব পূজা করেন। ভীড়ের সময় এখানে বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা থাকে যাতে মহেশ্বরের আরাধনায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

আজ কোন বিশেষ উপলক্ষ্য নেই। তবুও ভীড় নেহাৎ মন্দ নয়। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। পাশাপাশি আরো অনেক ভক্ত জড় হয়েছেন। বিগ্রহ শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ। পঞ্চমুখ। স্বর্ণ চক্ষু। প্রাণ ভরে মহেশ্বরকে দর্শন করলাম, পূজা দিলাম, করজোড়ে প্রার্থনা করলাম করুণাময়ের করুণা অপার শান্তি। অন্তরে অনুভব করলাম সেই চিরন্তন সত্য,—সমবেত আমরা সকলেই মহেশ্বরের কৃপাপ্রার্থী। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সামাজিক বৈষয়িক মূল্যায়ণ এখানে অর্থহীন। পূজারীর মন্ত্রপাঠ, বাদ্যযন্ত্রের সুর লহরীর মাধ্যমে দেবারতি, ধূপ দীপশিখার সুমধুর উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা, যেন এক অপরূপ আধ্যাত্মিক পরিবেশের দ্যোতনা। ভক্তপ্রাণও স্বর্গীয় অনুভূতিতে বিভোর।

পূজা শেষে প্রসাদ পেয়ে, মঙ্গল দীপশিখা স্পর্শ করে, মন্দির প্রাঙ্গণে নেমে এলাম। আশেপাশে ছোট কয়েকটা মন্দিরে স্থাপিত আছে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। তার মধ্যে অন্যতম অনন্ত শয্যায় নারায়ণ।

মন্দির চত্বর ছেড়ে পিছনের দিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। একেবারে বাগমতীর জলের ধারে। পূণ্য সলিলা বাগমতীতে দেখলাম খরস্রোত। পূণ্যার্থীরা এখানে স্নান সেরে পশুপতিনাথের পূজো দেন। উপস্থিত আমরা সকলে মাথায় জল ছিটিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে

উপরে উঠে এলাম। তারপর পুল পেরিয়ে বাগমতীর অপর পারে চলে এলাম।

সিঁড়ি বেয়ে চড়াই পথে এগিয়ে চলি। এপথে বানরের ভয়ানক উৎপাত। হাতে যা থাকবে হঠাৎ থাবা মেরে কেড়ে নেবে। তারপর ঘেঁটেঘুটে দেখবে খাবার কিছু আছে কিনা। না পেলে সব জিনিস ফেলে রেখে যাবে। আমাদের বেলায়ও এরকম ঘটেছে। যাইহোক পশুপতিনাথ মন্দির থেকে প্রায় ১ কিঃ মিঃ হেঁটে আমরা গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে উপস্থিত হলাম। কেউবা বলে পার্বতী মন্দির। মন্দিরময় কারুশিল্পের সমারোহ। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মাঝখানে গর্ভমন্দির। বিগ্রহ সিন্দুরলিপ্ত একখণ্ড পাথর। ফুল বেলপাতা দিয়ে প্রায় সবটাই ঢাকা। যথাবিধি মায়ের পুজো দিয়ে আশীর্বাদী ফুল নিয়ে ফিরে চলি।

ফেরার পথে সকলেই বিশ্ববিখ্যাত বোধনাথ স্তূপ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করল। অতএব সেদিকে এগিয়ে চললাম। পশুপতিনাথ মন্দির থেকে সোজা উত্তরে ২ কিঃ মিঃ দূরে বোধনাথ স্তূপ। এটাই নাকি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ। বৌদ্ধ ধর্মগুরু বিশেষতঃ লামাদের সাধন কেন্দ্র। এই চৈত্যটিও সুপ্রাচীন। প্রায় দু'হাজার বছর আগের।

এই স্তূপ নির্মাণ প্রসঙ্গে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। দেবী মণি যোগিণী একদিন স্বপ্নাদেশ দিলেন রাজা মানদেবকে। রাজা যদি ভক্তদের জন্য এই চৈত্য নির্মাণ করেন তবে তাঁর ইহজীবনের সমস্ত পাপ খণ্ডন হবে। রাজা তাই নির্মাণ করলেন এই বিশাল স্তূপ। যার নাম বোধনাথ স্তূপ।

এখানেও স্বয়ম্ভুনাথের মত চতুষ্কোণ গম্বুজে চার জোড়া চোখ। ভগবান বুদ্ধের সুদুর প্রসারী শান্ত সুন্দর দৃষ্টি। জীবের কল্যাণে সদা জাগ্রত নীলাভ দ্যুতি। স্তূপের চারিদিকে সারিবদ্ধ প্রার্থনাচক্র। ভক্তরা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যান। এই স্তূপের চারদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাস গৃহ। দেশ বিদেশের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে বাস করেন। তবে দেখে মনে হ'ল তিব্বতী লামাদের সংখ্যাই বেশী।

॥ আট ॥

এ যাত্রায় আরো একটা ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করেছিলাম। কিন্তু সময়ের অভাবে সেই ইচ্ছাটুকু আর পূরণ হ'ল না। সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থাদি করেও সেই পুণ্য সালিলে এ যাত্রা স্নান করা হল না।

সংসার জীবনের বিধিবদ্ধ পথে চলতে গিয়ে এরকম বহুবার শান্ত-সুন্দর রূপতৃষ্ণাকে দমন করতে হয়েছে। অদম্য ইচ্ছাকে বাধ্য হয়ে ভবিষ্যতের কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে পথ চলতে হয়েছে। তবে কোনবারই নিরাশ হই না। এবার না হয় পরের বার, না হয় তারও পরের বার যাব। তীর্থের দেবতা ডাক দিলে নিশ্চয় যাওয়া হবে। তাছাড়া ওপথ এমন কিছু দুর্গমও নয়। কাঠমাণ্ডু থেকে ত্রিশূলী বাজার হয়ে এই পুণ্যতীর্থ গোঁসাই কুণ্ড।

গোঁসাই কুণ্ড বা নীলকণ্ঠ হ্রদ। দেবতা ও দানবে মিলে করল সমুদ্র মন্থন। তুলে আনলেন অমৃত। অবশেষে দীর্ঘকাল মন্থনের ফলে উঠে এল গরল। সৃষ্টিকে বাঁচাতে মহেশ্বর সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করলেন। হলেন নীলকণ্ঠ। কিন্তু বিষের জ্বালায় তিনি অস্থির। হাতে তুলে নিলেন ত্রিশূল। প্রোথিত করলেন হিমালয়ের বুকে। সৃষ্টি হল এক শীতল জলকুণ্ড। মহেশ্বর তাতে স্নান করে প্রশমিত করলেন প্রচণ্ড দাহ। তাই কুণ্ডের নাম হল গোঁসাই কুণ্ড। সেই থেকে এই কুণ্ডের জল পবিত্র তীর্থবারি।

এই গোঁসাই কুণ্ড ছাড়া আরো কয়েকটা তীর্থকুণ্ড এ অঞ্চলে বিদ্যমান। যেমন নাগকুণ্ড, ভৈরব কুণ্ড সরস্বতী কুণ্ড এবং সূর্য কুণ্ড।

গোঁসাই কুণ্ড যাবার সব চেয়ে সুবিধাজনক পথ হচ্ছে ত্রিশূলী বাজার হয়ে। কাঠমাণ্ডু কোডারী সড়ক পথে। এ পথ চীনাদের তৈরী। রাজা মহেন্দ্রের চেষ্টায় চীনের সাহায্যে কাঠমাণ্ডু থেকে তিব্বতের

রাজধানী লাসা পর্যন্ত এ পথ নির্মিত হয়।

এ পথে কাঠমাণ্ডু থেকে বাসে কিম্বা যে কোন গাড়ীতে সোজা ত্রিশূলী বাজার। দূরত্ব ৭১ কিঃ মিঃ। ত্রিশূলী বাজারের উচ্চতা মাত্র ২০০০ ফুট। ত্রিশূলী বাজার থেকে ৮ কিঃ মিঃ দূরে বেত্রাবতী। বাস পথ আজ কাল বেত্রাবতী ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেছে।

যাইহোক বেত্রাবতী থেকেই মোটামুটি হাঁটাপথ। গ্রামটিও বেশ বড়। এখানে ত্রিশূলী এবং বেত্রাবতী নদী একসঙ্গে মিশেছে। নদীর দুধারে সারি সারি ঘর বাড়ী। হাঁটা পথের প্রয়োজনীয় সবকিছু এখান থেকে সংগ্রহ করা চলে।

বেত্রাবতী থেকে গোঁসাই কুণ্ড সম্পূর্ণ চড়াই পথ। ২৫০০ ফুট থেকে ১৪৫০০ ফুট। যাতায়াতে ৫।৬ দিন লাগে। বেত্রাবতী থেকে মণি-গাঁও। মণিগাঁও থেকে রামচে। তারপর থারে। থারে থেকে বোকাঝুণ্ডা। তারপর ধুনচে, চন্দনবাড়ী লাউরিবিনা—গোঁসাইকুণ্ড।

যাঁরা নেপালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ল্যাংট্যাং উপত্যকায় যেতে চান তাঁদেরও এ পথে ধুনচে পর্যন্ত আসতে হবে। ধুনচে থেকে একটা পথ চলে গেছে গোঁসাইকণ্ডু আরেকটা ল্যাংটাং-এর পথে বার্কু, স্যাব্রুবেশী, ঘাং জুং, শেরপাগাঁও, ঘোড়াতাবেলা হয়ে।

ল্যাং ট্যাং উপত্যকার উচ্চতা :প্রায় ১০ হাজার ফুট। যাঁরা ট্রেকিং করতে চান তাঁদের কাছে এই উপত্যকা স্বর্গপুরী। একদিকে তুষার শৃঙ্গ এবং মনোরম গ্লেসিয়ার অন্য দিকে সবুজ গালিচার আস্তরণ। ল্যাং ট্যাং উপত্যকায় এসে অনেকেই আরো খানিকটা এগিয়ে ক্যাং জিং গুম্ফায় চলে আসেন। কেউবা আরো একটু এগিয়ে ল্যাং ট্যাং উপত্যকার শেষ প্রান্ত ১৩ হাজার ফুট উঁচু ল্যাংসিসায় তাঁবু খাটান। কিম্বা পর্যটকদের জন্য নবনির্মিত ছোট ছোট ঘরে আশ্রয় নেন। ল্যাংসিসার খুব কাছেই বেশ কয়েকটা গ্লেসিয়ার। যেন মনে হয় হাতের নাগালের মধ্যে।

ট্রেকিং-এ যাঁরা পারদর্শী এবং বেশী উৎসাহী তাঁরা আরো একটা

দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য পথ বেছে নিতে পারেন। সেটা হচ্ছে এভারেষ্ট বেস ক্যাম্পের পথ।

কাঠমাণ্ডু থেকে গাড়ীতে লামোসাঙ্গু। মাত্র আড়াই তিনঘণ্টার পথ। এখান থেকে হাঁটা পথের সুরু। তাই পথের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং পোর্টার এখান থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়।

লামোসাঙ্গুর উচ্চতা প্রায় আড়াই হাজার ফুট। এখান থেকে চড়াই পথে থুলোপাখা (৫৭০০ফুট) এসে রাতের বিশ্রাম। পরের দিন চড়াই উতরাই ভেঙ্গে প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা হাঁটাপথে সেরাবেন্সি (৪৫০০ ফুট)। সেরাবেন্সি থেকে ফিরাস্তিছাপ (৪১০০ফুট)। তারপর যথাক্রমে ইয়ারসা, থোসে, ছ্যাংমা, সেতে, জুনবেসি, মণিদিংমা, খারি-খোলা, পুইয়ান, ফাকডিং, নামচে বাজার, খুমজুং থ্যাংবোচে এবং এভারেস্ট বেস্ ক্যাম্প। তবে সুস্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত সরঞ্জাম ভিন্ন থ্যাংবোচে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কেননা এভারেষ্ট বেস্ক্যাম্পের উচ্চতা প্রায় ১৭৫০০ ফুট।

॥ নয় ॥

এবার আমাদের বন্দর ছাড়ার পালা। কাঠমাণ্ডু ছেড়ে যাত্রা শুরু করতে হবে নেপালের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পোখরার দিকে। কেননা এ যাত্রায় আমাদের আসল উদ্দেশ্য মুক্তিনাথ দর্শন।

পোখরার বাসের টিকিট আগের দিন রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। সকাল ৬॥ টায় বাস ছাড়বে। সোওয়া ছ'টায় ষ্ট্যাণ্ডে বাস আসতেই সকলে উঠে পড়লাম। সীট নাম্বার জানাই ছিল। কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরার দূরত্ব বাসে ১৯০ কিঃ মিঃ।

এই বাস পথের ইতিহাস কিন্তু বেশীদিনের নয়। আগে কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা যেতে হলে প্লেন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এখন এই সড়কপথে নেপালের পূর্ব সীমান্ত থেকে পশ্চিম সীমান্তের সংযোগ ঘটেছে। আগে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়া ছিল বিশেষ কষ্টসাধ্য। প্রথমে দক্ষিণে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে তারপর রেল কিম্বা সড়ক পথে এগিয়ে গিয়ে নেপালের পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ করা।

নেপালের বর্তমান সড়ক পথের যে উন্নতি তার বেশীর ভাগ কৃতিত্ব রাজা মহেন্দ্রের। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য নেপালের পূর্ব সীমান্ত থেকে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক পথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। তাঁর এই স্বপ্নকে রূপ দিতে রাশিয়ানরা এগিয়ে আসে। জরীপ থেকে আরম্ভ করে ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে পাহাড় কেটে পাথর ভেঙ্গে তারা কয়েক বছরের মধ্যেই পথটি সম্পূর্ণ করে দেয়। পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এই পথটির নাম মহেন্দ্র রাজ পথ। নেপালের বিখ্যাত তিনটি রাজপথই বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে তৈরী। যেমন বীরগঞ্জ কাঠমাণ্ডু সড়ক যেটা ত্রিভুবন রাজ পথ নামে পরিচিত, ভারত সরকারের তৈরী। তেমনি এটি রাশিয়ার সাহায্যে এবং কাঠমাণ্ডু কোডারী রোড যেটা তিব্বতের রাজধানী

লাসা পর্যন্ত বিস্তৃত, চীনের সাহায্যে তৈরী।

সকালে কাঠমাণ্ডু থেকে রওনা হয়ে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পোখরা পেঁীছে গেলাম।

অবশ্য যাঁরা শুধু মুক্তিনাথ দর্শনে আসবেন তাঁদের পক্ষে গোরক্ষপুর হয়ে আসাই সহজ। গোরক্ষপুর পর্যন্ত রেলে এসে বাসে ৯৬ কিঃ মিঃ ভারতের সীমান্ত সহর সোনাউলী। এই চেক পোষ্ট পেরিয়ে ৪ কিঃ মিঃ দূরে নেপালের সীমান্ত সহর ভৈরবা। ভৈরবা থেকে পোখরা বাসে ১৯০ কিঃ মিঃ। সময় লাগে ৭।৮ ঘণ্টা।

আমরা মুক্তিনাথ যাত্রী হলেও আরেকবার পশুপতিনাথ দর্শন করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তা ছাড়া ফেরার পথে ভগবান বুদ্ধের জন্ম এবং মহাপ্রয়াণ ক্ষেত্রটা দেখার ইচ্ছাও প্রবল। তাই বিহার সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত দিয়ে ফিরে আসার পরিকল্পনা নিয়েই আমরা চলেছি।

ফেরার পথে আমরা তাই করেছিলাম। পোখরা থেকে বাসে ভৈরবা বা সিদ্ধার্থ নগর। সিদ্ধার্থ নগর বেশ বড় জায়গা। নেপালের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে এখানকার প্লেন সার্ভিস রয়েছে। এখানে হোটেলের সংখ্যাও কম নয়। দোকানে দোকানে বিদেশী জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। বিশেষ করে কাপড় চোপড়, ঘড়ি পেন ষ্টিলের বাসনপত্র এবং প্রসাধন সামগ্রী। ভারতগামী প্রত্যেককেই দেখলাম কিছুনা কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য উৎসুক। তা সে লুকিয়েই হোক আর সীমান্তে ব্যবস্থা করেই হোক। আমাদের নিজেদের কথা আর লিখলাম না। তবে এইটুকু স্বীকার করছি ফেরার সময় আমরাও সম্পূর্ণ নির্লোভ ছিলাম না।

পোখরা থেকে বাসে সকাল ৭½টায় রওনা হয়ে বিকেল ৩টা নাগাদ ভৈরবা পেঁীছলাম। সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। কৈলাস হোটেল। দক্ষিণার তুলনায় ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল।

সকালে উঠেই লুম্বিনী রওনা হলাম। ভৈরবা থেকে ২১ মাইল।

মিনিবাস এবং ট্যাক্সি দুই চলাচল করে।

ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান এই লুম্বিনী। নেপালের তরাই অঞ্চলে রূপেণ দেহী জেলায়।

খৃষ্টপূর্ব ৬২৩ বৎসর আগে এক পূর্ণিমা রাতে এই লুম্বিনী কাননে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। সেদিনের সেই নন্দন কাননে এখন কাননের অংশ সীমিত। সে জায়গায় বেশ কয়েকটা বাড়ী উঠেছে।

লুম্বিনীর আরেক আকর্ষণ অশোক স্তম্ভ। বুদ্ধদেব যে এখানে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন তা এই স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে।

অশোক স্তম্ভের মত মায়া দেবীর মন্দির ও এখানকার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। মন্দিরের অভ্যন্তরের এক প্রস্তর খণ্ডে ভগবান বুদ্ধের জন্ম বৃত্তান্ত অঙ্কিত আছে। ভক্ত মাত্রেই এই চিত্রিত প্রস্তর খণ্ডে প্রার্থনা জানায়।

অনেকের ধারণা মায়াদেবীর এই মন্দিরটি অশোক নির্মিত আরেক স্তূপের ধ্বংসাবশেষের উপর পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে। লুম্বিনীতে অশোকের আগমন ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। সে সময় তিনি এখানে অনেক স্তূপ ও নিবাস তৈরী করেছিলেন। তার অংশ বিশেষ এখনো বিদ্যমান।

মায়াদেবীর মন্দিরের দক্ষিণে একটা পুকুর আছে। সেটা নাকি খনন করিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের পিতা রাজা শুদ্ধোধন। কথিত আছে বুদ্ধের জন্মের পর এই পূণ্যপুকুরে প্রথম স্নান করানো হয়। তাই আমরাও এই পবিত্র অমৃতবারি মাথায় দিয়ে ধন্য হলাম।

এই লুম্বিনীতে বর্তমানে আরো কয়েকটা বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়েছে। পর্যটকদের আকর্ষণ করার মত একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। লুম্বিনীতে থাকাকালীন আমরা বহু বিদেশী পর্যটককে দেখলাম। তাদের বেশীরভাগই বার্মা থাইল্যাণ্ড চীন এবং জাপান থেকে আগত।

লুম্বিনী থেকে আবার ভৈরবায় ফিরে আসি। ফেরার পথে

গোরক্ষপুর হয়ে কুশীনগরে হাজির হই। লুম্বিনী দেখার পর তাঁর মহাপ্রয়াণের পুণ্যক্ষেত্র কুশীনগর যাবার পরিকল্পনা আমরা আগেই করে রেখেছিলাম।

গোরক্ষপুর থেকে বাসে মাত্র ৬৫ কিঃ মিঃ পথ।

কুশীনগরের পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হলাম। কি সুন্দর মনোরম পরিবেশ। মহান শান্তি-দূতের উপযুক্ত শান্ত নীড়।

স্মৃতিপটে ভেসে উঠল আড়াই হাজার বছর আগের এক প্রেক্ষাপট। সেদিনের এক পুণ্যলগ্নে মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল নরদেহী এক ভগবানের। সেই পবিত্র দেবস্থানের মাটি স্পর্শ করে আমরা ধন্য হলাম।

সত্যিই অপূর্ব এক পরিবেশ। ঘেরা জায়গাটার ভেতরে প্রশস্ত উদ্যান। সবুজ ঘাসের আস্তরণ। তার মধ্য দিয়ে লালমাটির সরু পথ। পথের ধারে সারি সারি ফুল গাছ। কত বিচিত্র ফুল, রূপে গন্ধে ভরপুর! বাতাসে দোলায়িত লজ্জানম্র শিহরণ। ভ্রমরের গুঞ্জরণে ও সুমধুর ঐক্যতান। রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীল আকাশের নিচে প্রকৃতির এই লীলা বৈচিত্র মহামানবের মহাপ্রয়াণের স্বর্গীয় দ্যোতনার পরিপূরক।

কুশীনগরে প্রাচীন নির্মাণ কার্যের ধ্বংসাবশেষ আজো বর্তমান। ভগবান বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের নির্দিষ্ট জায়গাটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও চিহ্নিত করা আছে। আশেপাশে নতুন তৈরী বৌদ্ধ মন্দির ও রয়েছে। তবে মহাপ্রয়াণ ক্ষেত্র সংলগ্ন মন্দিরটি ভক্তমনে সাড়া জাগায়। মন্দিরের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের মহাপ্রয়াণ লগ্নের শায়িত নির্বাণ রূপ। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহান মানবাত্মার স্মৃতির প্রতি যাত্রী মাত্রেই শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়।

পাশেই রাস্তার দিকে আরেকটা সুন্দর মন্দির। International Meditation Centre· জনৈক চৈনিক ভক্তের তৈরী। মন্দির মধ্যে অঙ্কিত রয়েছে ভগবান বুদ্ধের সচিত্র জীবন গাঁথা।

কুশীনগর পরিক্রমা শেষে গোরক্ষপুর ফেরার পথে কাশিয়া চলে এলাম। কুশীনগর থেকে কাশিয়া ৩ কিঃ মিঃ। কুশীনগরে হোটেল রেষ্টুরেন্ট বলতে কিছুই নেই। বাস রাস্তার উপর একচালা ২।৪ টা ছোট ছোট দোকান। দুপুরের আহারের জন্য সাইকেল রিক্সা করে তাই কাশিয়া চলে যেতে হল। কাশিয়া বেশ বড় জায়গা। অনেক দোকানপাট ঘরবাড়ী। বিরাট বাসস্ট্যাণ্ড। খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে বাসে গোরক্ষপুর ফিরে এলাম।

॥ দশ ॥

পোখরা নেপালের এক শ্রেষ্ঠ রমণীয় উপত্যকা। এই উপত্যকা সম্বন্ধেও সেই একই কথাই প্রচলিত। কাঠমাণ্ডু বা শ্রীনগরের মত এই পোখরাও নাকি এককালে একটা বিরাট জলাশয় ছিল। কালক্রমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল স্থলভাগে রূপান্তরিত হ'ল। বাকী অংশ সেই জলাশয় অর্থাৎ হ্রদের আকারেই রয়ে গেল।

পোখরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুবনবিদিত। একদিকে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। মাথার উপর শ্বেত শুভ্র তুষার শৃঙ্গ। বিশেষ করে অন্নপূর্ণা এবং মচ্ছপুছারে। মনে হয় যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রান্তসীমায় উঁকি মারছে মানাস্‌লু, হিমলচুলি, ধৌলাগিরি এবং গণেশ হিমল। সবচেয়ে বাহারি রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মচ্ছ-পুছারে। আকৃতি অনেকটা মাছের লেজের মত। তাই নাকি নাম হয়েছে মচ্ছ পুছারে।

গিরিশৃঙ্গের পদতলে প্রশান্ত শ্যামল এই উপত্যকা। তারি মধ্যে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, হ্রদ, নদী, গিরিখাদ। সব মিলিয়ে পোখরা যেন এক রহস্যময়ী সুন্দরী রূপসী। তার উজ্জ্বল রত্নহারের নীলাভ স্ফটিক রত্নরাজী হচ্ছে ফেউয়াতাল, বেগনাসতাল, রূপাতাল ইত্যাদি। এসব তাল বা হ্রদের জলে হাওয়ায় তরঙ্গভঙ্গে শতরঙ্গে নাচে হিমগিরির রত্নশিখর। অদূরে শ্বেতী নদী। আঁকা বাঁকা গন্তিপথ। যেন রূপসীর টানা নথ্‌।

পোখরা এয়ার পোর্টের প্রকাণ্ড প্রান্তর সবুজ গালিচায় ঢাকা। পাশ দিয়ে চলে গেছে প্রশস্ত পথ। এঁকে বেঁকে এদিকে সেদিকে নানা দিকে। পথের দু'পাশে কোথাও বা গাছপালা লতাগুল্ম। বিভিন্ন পরিধির ছায়া। কোথাও বা সারি সারি ঘরবাড়ী, অফিস কাছারী। আবার কোথাও বাজারের এলোমেলো দোকান পসারী।

ত্রস্ত ধীর পথচারী, দেশী ভীনদেশী। সর্বাঙ্গ বৈচিত্রময়। পরিচ্ছদে কিম্বা প্রসাধনে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নীল আকাশে ভেসে ওঠে গিরি মন্দিরের শ্বেত শুভ্র চূড়া। মহাশূন্যে ভাসমান সহস্র তারার আলোবিন্দুর প্রতিফলন পোখরার সমগ্র উপত্যকা জুড়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিম্বা সারি সারি দীপালোক। পথেঘাটে দোকানে বাজারে। ঢালু পাহাড়ের প্রতি ঘরে। কী সূর্যালোকে কী চন্দ্রালোকে পোখরা আপন রূপ মহিমায় ভাস্বর।

শহরের কেন্দ্রস্থলে হলিডে হোটেলের দোতলায় আমরা ঘর নিয়েছি। বেশ কিছু বিদেশী যাত্রীও আছে এই হোটেলে। কথা বলে জানলাম অনেকে আমাদের পথেই যাবে। বলা বাহুল্য তীর্থ করতে নয়। শুধুমাত্র ট্রেকিংয়ের আকর্ষণে। শুনতে পেলাম হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ছাড়া মুক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। শুধু মন্দিরে নয়, মন্দির পর্যন্ত পৌঁছতে হলে বিদেশীদের অনুমতি পত্র নিতে হয়। এর প্রধান কারণ নাকি সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তার ভাবনা। হোটেলে বহু বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ হল। কয়েকজনের সঙ্গে সখ্যতাও জন্মে গেল। বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ার শিশুবিশেষজ্ঞ ডাঃ রির্চাড রীপার, জার্মানীর ওয়াইজ মার্ক, হল্যাণ্ডের জর্জ ও তার বান্ধবী ডরোথির সঙ্গে।

আগামীকাল ওরাও আমাদের সঙ্গে যাত্রা সুরু করবে। যাক ভালই হল। হাজার হোক পথের সঙ্গী তো। হোলোই বা বিদেশী। তবে কথা হচ্ছে কে কতক্ষণ সঙ্গে থাকবে বলা কঠিন। হাঁটা পথে কার গতি কেমন হবে বলা দুস্কর। রাতের আস্তানাও হয়ত সকলের এক জায়গায় হবে না। কেউ এগিয়ে যাবে আবার কেউ ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবে। যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী পথ চলবে। পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ সমান তালে চলতে পারে না। আবার হল্যাণ্ডের ভেজালহীন সুষম খাদ্যে গড়া শরীরের বিক্রম দূষিত

কলকাতার ভেজাল ক্লিষ্ট দেহের তুলনায় অনেক বেশী।

সকালবেলা যথা সময়ে কুলী এসে হাজির। শের বাহাদুর ও বিক্রম। হোটেলের এক কর্মচারী ঠিক করে দিয়েছে। ওরা এপথে আগেও যাত্রী নিয়ে গেছে। অতএব অচেনা লোক নিয়ে পথের দুশ্চিন্তা খানিকটা কাটল। তা ছাড়া দশেরা আগতপ্রায়। এ সময় কেউ ঘর ছেড়ে থাকতে চাই না। কার যে কখন কি মতি হবে—! দুট্ করে বললেই হ'ল—চললাম পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিন। তাই হোটেলের ম্যানেজারের জবানীতে সব কথা পাকা করে নিলাম। আমাদের প্রয়োজন ফুরোলেই ছুটি। দৈনিক মজুরী মাথাপিছু ২৫ টাকা (নেপালী মুদ্রায়)। চা জলখাবার দুবেলা আহার ওদের নিজেদের। হোটেলের লোক কানে কানে এও বলেদিল—অগ্রিম যেন বেশী টাকা হাতে না দিই।

আমরা পাঁচজন যাত্রী। স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ আমরা চারজন আর বন্ধুবর লক্ষ্মী নারায়ণ দাস। পাঁচজনের মাল দুজন কুলীতে অনায়াসে নিতে পারে। হিসেব মত একজনের ২৫।৩০ কেজি মাল নেবার কথা। আমাদের অবশ্য সব মিলিয়ে ৪০ কেজিও হবে না। তাছাড়া এ পথে জামাকাপড় এবং টুকটাক খাবারদাবার ছাড়া কিছুই নেবার প্রয়োজন হয় না। পথে সবই পাওয়া যায়। একেবারে রাজকীয় বন্দোবস্ত। এমন কি কাঠমাণ্ডু পোখরার স্বাচ্ছন্দ্য ও ও অনায়াসে মেলে। তবে পয়সা তুলনায় একটু বেশী লাগে। এর একটা মাত্র কারণ, মালপত্র বয়ে আনার বাড়তি খরচ।

কিছু মালপত্র হোটেলেই রেখে গেলাম। এ পথেই যখন ফিরব তখন বাড়তি যা কিছু রেখে যাওয়াই শ্রেয়।

হোটেলে চা জলখাবার খেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। ভিন্‌দেশী সহযাত্রীরাও দেখলাম তৈরী। কারো সঙ্গে কোন কুলী নেই। যার যার মাল তার তার কাঁধে। হালকা রুকসাকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম।

॥ এগার ॥

হোটেল থেকে পথে নামলাম। দীর্ঘ হাঁটা পথের সুরু। বাজার এলাকার মধ্য দিয়ে চলেছি। পথের ধারে সারি সারি দোকান ঘরবাড়ী। গাড়ী ঘোড়া জন কোলাহল। দূরে চোখের সামনে সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত চির নির্জন তুষার শৃঙ্গ। অন্নপূর্ণা, মচ্ছ পুছারে গনেশ হিমল, ল্যাং ট্যাং। হিমশীতল শান্ত নির্জন পথের অগ্রদূত। প্রকৃতি প্রেমিক সকলকেই হাতছানি দিয়ে ডাকে,—এসো, এগিয়ে এসো, কাছে, আরো কাছে। এখানে ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত রত্ন-ভাণ্ডার। চোখ ভরে দেখ, মন ভরে সঞ্চয় কর। ভবিষ্যতে অক্ষম অলস মুহূর্তে স্মৃতি থেকে ঝরে পড়বে মৃতসঞ্জীবনী সুধা। রোমাঞ্চকর শিহরণে পলকে পুলকিত হবে তনু-মন। বার্ধক্যের স্বপ্ন-মধুর বারাণসী।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। শহর জীবনের কোলাহল ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে। একসময় সহরের প্রান্ত সীমায় উপস্থিত হলাম। দোকানপাট যা কিছু এখানেই শেষ। কেনাকাটা বাকী থাকলে শেষবারের মত এখানেই সেরে নিতে হবে।

হটাৎ খেয়াল হল কিছু নেপালী টাকা সঙ্গে থাকা দরকার। পথে যদি কেউ ভারতীয় টাকা নিতে না চায়? কিম্বা বিনিময়ের হার কম দিতে চায়? শের বাহাদুরকে ডেকে বলতেই সে জানিয়ে দিল টাকা পাল্টাবার কোন প্রয়োজন নেই। ভারতীয় টাকা নেপালের সর্বত্রই চলে। বিনিময়ের হারও সর্বত্র এক। অতএব এ ব্যাপারে নির্ভাবনা।

এখন একটামাত্র ভাবনা পথ চলা। সবে শুরু, শেষ এখনো বহু দূরে। চল এগিয়ে চল। ধ্বনি তুলি জয় বাবা মুক্তিনাথ। বিদেশী সহযাত্রী উৎসুক নয়নে তাকায়।

এবার পথ বাঁদিকে ঘুরে গেছে। শহর ছেড়ে নির্জনতার পথে।

কোলাহল ছেড়ে কলগীতের টানে। স্বেতী, মোদি, কালী গঙ্গার সুমধুর কলতানের পানে।

খানিকটা পথ এগোতেই দেখি একটি নদী। অপরিসর খরস্রোতা। স্বেতী নদী। নদী তীরে এলোপাথারি ভাঙনের ছাপ। নদীর তীর ধরে এগিয়ে চললাম। আরো কিছুটা পথ এগিয়ে একটা কাঠের পুল পেরিয়ে নদী পার হলাম। পথ প্রায় সমতল। চড়াই উতরাই নেই বললেই চলে। তবে নদীতীরে ভাঙন এত বেশী কোথাও কোথাও পাথরের উপর খুব সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। যাই হোক মাইল দুয়েক এগোতে একটা গ্রাম পেলাম।

'হুন্‌জা' গ্রাম। গ্রামটা বেশ বড়। যেমন আয়তনে তেমন লোকসংখ্যায়। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে চলার সময় মনে হয়েছে হুন্‌জা একটা গ্রাম নয়, কয়েকটা গ্রামের সমষ্টি। তবে সবটাই হুন্‌জা নামে পরিচিত।

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগই তিব্বতী। শুনলাম অনেক তিব্বতী বাস্তহারা এই গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ।

চলার পথ গ্রামের মধ্য দিয়ে। রাস্তা সংলগ্ন কোন কোন বাড়ীর দাওয়ায় টুকিটাকি জিনিস নিয়ে দোকান সাজিয়ে রেখেছে। কোথাও বা চায়ের দোকান। চা পানের জন্য আমরাও এক জায়গায় বসে পড়লাম। দোকানের সামনে গাছের ছায়ায়। একটা ভাঙ্গা বেঞ্চি পাতা। পাশেই গাছের নিচে একটা শান বাঁধানো বেদী, তার উপর একটা আধ ময়লা সতরঞ্চি পাতা। তাতে বসা যায়। চা খেতে খেতে পথের দিকে নজর পড়তেই দেখলাম, সেই যুগল হল্যাণ্ডবাসী জর্জ আর ডরোথি। দুজনের একই ধরণের পোশাক। স্যাণ্ডো গেঞ্জী আর সর্টস। কে ছেলে কে মেয়ে বোঝা দুষ্কর। কাছে আসতেই চায়ের নিমন্ত্রণ জানালাম। হাসি মুখে কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বেদীর উপর কাঁধের বোঝা নামিয়ে বসে পড়ল। দোকানী একজন

মাঝবয়সী তিব্বতী মহিলা। দ্রুতলয়ে একহাতে সব করে যাচ্ছে। চা খেতে খেতে গ্রামের কথা জানতে চাইলাম। নেপালে এত বড় গ্রাম নাকি খুব কমই আছে। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকের রুজি রোজগার পোখরাকে কেন্দ্র করে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। রুজি রোজগারে তারাও পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে খাটে। কথাটা অবশ্য ঠিক। পাহাড়ী অঞ্চলে মেয়েরা বেশ তৎপর এবং শ্রমশীল। শুধু নেপাল নয় সমগ্র হিমাচলে এবং গাড়োয়ালেও একই ছবি। কোথাও কোথাও বিশেষতঃ তমসা গাড়োয়ালে দেখেছি সংসারে বারোআনা দায় দায়িত্ব মেয়েরাই বহন করে। পুরুষরা গাছের ছায়ায় খাটিয়ার উপর হুঁকো নিয়ে গল্প-গুজবে দিন কাটায় আর সন্ধ্যায় নেশা করে পড়ে থাকে। এটা আমাদের অস্বাভাবিক মনে হলেও ওখানকার মেয়েদের কাছে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

যাই হোক আবার চলা সুরু। দলের চারজন আগেই এগিয়ে গেছে। আমি অপেক্ষায় ছিলাম বিদেশী বন্ধুদের জন্য। চলতে চলতে সুরু হল দু'চারটে ঘরোয়া কথা। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েকে না দেখলে তারা নাকি বিশ্বাসই করত না আমার বয়সটা। পরে মৃদু হেসে জানতে চাইল আমার জীবনে রোমান্সের ভূমিকা। কি উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে মুখ তুলে একটু হাসলাম। কি করে বোঝাব বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের জীবনে রোমান্স হচ্ছে ইন্দ্রিয়তাড়িত উপদ্রব বিশেষ। প্রশ্রয় দিলে বিশেষ ভোগান্তি। তাই ওসবে আমরা বিশেষ আমলই দিই না। আমার কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল না। যাই হোক তারা কিন্তু অকপটে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাই বলে গেল। স্কুল জীবন থেকেই উভয়ে পরিচিত। কলেজ জীবনেও উভয়ে সহপাঠী। তারপর এলো চাকরীজীবন। জর্জ বিগত চারবছর ধরে চাকরীরত। ডরোথি মাত্র এক বছর হল চাকরী পেয়েছে। ওরা ঠিক করেই রেখেছিল—ডরোথির চাকরী হলে এক বছর পরে দুজনে কন্টিনেন্টাল ট্যুরে বেরোবে। আর্থিক অবস্থা

সীমিত তাই ওরা এবার নেপাল ছাড়া আর কোথাও যেতে পারবে না। ছুটিও বেশী নেই, মাত্র ২০ দিন। এবার ছুম্ করে একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসলাম—আচ্ছা তোমরা তো উভয়ে উভয়কে ভালবাস; তাহলে বিয়ে করছ না কেন? কথা শুনে ডরোথি একবার জর্জের দিকে তাকাল। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে আগে আগে হাঁটতে লাগল। জর্জ কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলে চলে। জর্জের ইচ্ছা ছিল বিয়ে করার। কিন্তু ডরোথির মা'ই নাকি বারণ করেছে। বলেছে—দ্যাখো, ডরোথি বড্ড খাম খেয়ালী। বিয়ে থা করে ঘর সংসারী হতে গেলে যে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার দরকার ডরোথির তা নেই। তাই আমি বলি কি, তোমরা যে যেমন আছ তেমন থাক। মেলামেশায় যখন তোমাদের কোন অসুবিধা নেই তখন আর ভাবনা কি। তাই ওরাও স্থির করেছে বাকী জীবনটা বন্ধু হিসাবেই কাটিয়ে দেবে। মনে মনে ভাবি ওদের সমাজ জীবনে কি অপরিসীম স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত জীবনের কোন প্রসঙ্গেই সমাজ কিম্বা পাড়া প্রতিবেশী কারো কাছে জবাব দিহি করতে হয় না। মনে ঈর্ষা জাগে। কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রশ্ন জাগে—আচ্ছা, শান্তি কোন পথে? আত্মীয় পরিজন পরিবৃত বিবাহিত জীবনের বহুমুখী সরস অনুভূতিই আমাদের সমস্যাসঙ্কুল জীবনের একমাত্র পাথেয়। আমরা সুখে দুঃখে সবকিছু নিয়ে সব কিছুর মধ্যেই বেঁচে থাকতে ভালবাসি। ওরা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। বন্ধন মুক্ত একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবনই ওদের পছন্দ। ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করবে নিছক নিজের স্বার্থে। চিন্তার তাত্ত্বিক পরিধি হয়ত আরো বিস্তার লাভ করত কিন্তু চলার পথের হঠাৎ পট পরিবর্তনে আবার বাস্তবে ফিরে এলাম।

ছনজা গ্রামের শেষ সীমায় এসে গেছি। এবার চোখের সামনে টানা ধানক্ষেত। তারি মধ্য দিয়ে পথ। অনেকটা চওড়া আলের উপর দিয়ে ডাঁয়ে বাঁয়ে দূরপ্রান্তে না তাকালে মনে হবে শরতের গ্রাম বংলার কোন এক পল্লী অঞ্চল। বাতাসে হিল্লোলিত ধানের

চারা। গাছের গোড়া জলে ডোবা। আলপথও জায়গায় জায়গায় ভাঙা। লাফিয়ে জল ডিঙোতে হয়। কোথাও বা জলকাদা এড়াতে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে।

ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে প্রায় ২ কি: মি: চলার পর অদূরে কয়েকটা ঘরবাড়ী নজরে পড়ল। বিক্রম অর্থাৎ আমাদের কিশোর সাথী বললে ওটাই সুঁইক্ষেত গ্রাম। ওখানেই দুপুরের আহার সারতে হবে।

আহারের কথা মনে হতেই সকলের চলার গতি বেড়ে গেল। তাছাড়া বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই। সমতল গ্রাম্য পথ। আর মাত্র দুই কিলোমিটার গেলই আহার ও বিশ্রাম। অতএব চল এগিয়ে চল। যতটা দ্রুতলয়ে সম্ভব।

দুপুর ১২টা নাগাদ, সুঁইক্ষেত্র গ্রামে পৌঁছে গেলাম। সুঁইক্ষেত কথাটার মর্মার্থ হচ্ছে সুক্ষেত্র অর্থাৎ এখানকার ক্ষেত্র সুফলা।

সুঁই ক্ষেত। ছোট্ট গ্রাম। মাত্র কয়েক ঘর বাসিন্দা। শের বাহাদুর আর বিক্রম একটা চালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকতেই একটা সুন্দরী যুবতী মেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। দু'চারটে কথা বলার পর দেখলাম উভয়ে কাঁধের বোঝা নামিয়ে রাখল। আর আমাদের বলল দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা এখানেই হবে।

মেয়েটিও হাসিমুখে সাদর আহ্বান জানাল। আমরা ঘরের মধ্যে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। খড়ের চাল, দরমার বেড়া, মাটির মেঝে। তবে ঘরের ভেতরটা বেশ প্রশস্ত। পরিষ্কার ছিমছাম। বাসনপত্র আসবাব সব কিছুই আধুনিক রুচিসম্পন্ন। প্রয়োজনে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ও নাকি আছে।

যাই হোক, মেয়েটাকে বললাম একটু তাড়িতাড়ি ব্যবস্থা করতে। ইতিমধ্যে মেয়েটার বাবা ও এসে হাজির। নাম খান বাহাদুর। এখানে বাপ মেয়ের অস্থায়ী সংসার। স্থায়ী নিবাস 'মার্ফা'। জুমসুম এর আগের গ্রাম। পরিবারের সবাই সেখানে থাকে।

এখানে শুধু এই ব্যবসার প্রয়োজনে অস্থায়ী আবাস। সেপ্টেম্বর থেকে যাত্রী সমাগম সুরু হয়। চলে মার্চ পর্যন্ত।

মেয়েটা তাড়াতাড়ি কাঠের উমুনটা উস্‌কে দিয়ে, ভাত আর ডিম সেদ্ধ বসিয়ে দিল। ডাল আর সজী রান্না করা আছে।

মেয়েটা একহাতে সবদিক সামলাচ্ছে। বাইরের খদ্দের ছাড়া গাঁয়ের লোকজন ও সওদা নিয়ে যাচ্ছে। কেউ চা, কেউ পানবিড়ি, কেউবা আইসক্রীম লেমোনেড। বাপ এক কোণে বসে আনাজের খোসা ছাড়াচ্ছে।

একঘণ্টার মধ্যে আমাদের আহার পর্ব শেষ। সাথী দুজনও আমাদের পাশে বসে খেয়ে নিল। তাদের পরিবেশন করার সময় মেয়েটার যেন একটু বিরক্তি ভাব। পরে বুঝলাম মাত্রাতিরিক্ত পরিমানের জন্যই এই ক্ষোভ। কথাবার্তা সম্যক না বুঝলেও এটুকু বুঝলাম, সাথীদের বক্তব্য, খদ্দের জুটিয়ে দিয়েছে তার বিনিময়ে তারা একটু বাড়তি অনায়াসে দাবী করতে পারে। যাই হোক, ওরাও দেখলাম আমাদের হিসাবে দাম মিটিয়ে দিল। পরিশেষে দুটি সিগারেট ও বাড়তি আদায় করে নিল।

॥ বার ॥

আবার চলা সুরু। সকাল থেকে এ পর্যন্ত ১২ কিঃ মিঃ হেঁটেছি। আজ আর কতটা হাঁটতে হবে এখনো বলা যাচ্ছে না। সব কিছু আবহাওয়ার উপর নির্ভর করছে।

সুঁইক্ষেত গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলাম। এবার পথ বিরাট এক প্রান্তরের উপর দিয়ে। এই প্রান্তরের বুক চিরে অনেক জলধারা গ্রামের পাশ দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। প্রান্তরটাকে মনে হচ্ছে যেন এক প্রকাণ্ড বেলাভূমি। উপর দিয়ে কয়েকটি অগভীর প্রবাহ বয়ে চলেছে। পথ চলতে কয়েকবার এই জলধারাকে অতিক্রম করতেই হবে। অতএব জুতো মোজা খোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেষের দিকে এক জায়গায় জলস্রোত খানিকটা তীব্র এবং গভীর। সেখানে দেখলাম কয়েকটা তক্তা ফেলে পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পোখরা থেকে টানা সমতল পথের এখানেই শেষ। এবার পথ সম্পূর্ণ চড়াই। এই চড়াই পথে ২ কিঃ মিঃ গেলেই নাগডাণ্ডা। পাথুরে পথ, কোথাও সিঁড়ির মত ধাপ করা। আবার কোথাও ঝুরঝুরে বালি আর পাথরের উপর দিয়ে চলা।

একটা বাঁক নিতেই দেখি একটা চওড়া পাথরের চাতালের উপর বেশ কয়েকজন সাহেব মেম একদৃষ্টে নিচে সমতলের দিকে চেয়ে আছে। তাদের দেখাদেখি আমিও ফিরে তাকাই। এতক্ষণে বুঝলাম তারা একদৃষ্টে কি দেখছে—। উঁচু থেকে নিচে সমতল প্রান্তরটা মনে হচ্ছে যেন পটে আঁকা ছবি। বিশাল এক প্রান্তরের একদিকে শুভ্র বেলাভূমি। তারি উপর দিয়ে নদীর স্বচ্ছ জলধারা বয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বিরাট এক সাদা পাথরের উপর ফালি ফালি কাঁচের টুকরো কেটে বসিয়ে দিয়েছে। তারপর সবুজ ধানক্ষেতের পাশে

পাশে কয়েকটি খড়ের চালের ঘর। চালের উপরও সবুজ আস্তরণ। লাউ কুমড়ো শশা কিংবা পাহাড়ী বিন। প্রান্তরের প্রান্তে সুউচ্চ পাহাড় ক্রমশঃ ঢালু হয়ে সমতলের সবুজের সঙ্গে মিশে গেছে।

সাহেবরা উঠে পড়ল। আমিও চলতে সরু করলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তারা জুমস্থুম থেকে ফিরছে। কেমন লেগেছে বলাতে এক কথায় উত্তর পেলাম—ওয়াণ্ডারফুল।

রোদের ভয়ানক তেজ। চড়াই পথে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গীরা সবাই এগিয়ে গেছে। তাতো যাবেই। পাহাড়ী পথে বয়স আর ওজনই হচ্ছে সমস্যা। তাই পিছিয়ে পড়াটা আমার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। রেইন কোট কোমরে জড়ানোই ছিল। খুলে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। তাতে কষ্ট আরো বেড়ে গেল। একে গরম তার উপর হাওয়া বাতাস বন্ধ। কিছুদূর এগিয়ে বাধ্য হয়ে খুলে ফেললাম। খোলা অবস্থায় মাথার উপর ফেলে হাতা দুটো হাত দিয়ে ধরে রাখলাম।

সুঁইক্ষেত থেকে নাগডাণ্ডা হিসেবমত ২ কিলোমিটার। কিন্তু মন মানতে চাইছে না। দুই কিলোমিটার এতক্ষণেও ফুরোচ্ছে না? পরক্ষণেই ভাবি তীব্র চড়াই পথে ২ কিলোমিটার সময়ের হিসাবে তিনচার গুণ।

যাক এবার মনে হচ্ছে এসে গেছি। কয়েকটা ছেলেমেয়ে ঢালু জায়গায় ভেড়া চড়াচ্ছে। অদূরে কয়েকজন গ্রাম্য মেয়ে ঘাস কাটছে। জোর পায়ে এগিয়ে চলি। মনে মনে ভাবি এগোলেই নাগডাণ্ডা। বিশ্রাম ক্ষেত্র। সকলের যদি ইচ্ছা হয় এখানেই আজ বিশ্রাম নেব।

বেলা তিনটে নাগাদ নাগডাণ্ডা পৌঁছে গেলাম। সুঁইক্ষেত থেকে দুই কিলোমিটারে প্রায় ১৫০০ ফুট উঠেছি। খানিকটা এগোতেই দলের সবাইকে দেখতে পেলাম। রাস্তার ধারে একটা

চায়ের দোকানের বারান্দায় বসে সবাই চা খাচ্ছে। লেবু চা। আমিও গিয়ে যোগ দিলাম।

পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। তবে বুঝলাম দেহের ক্লান্তি মনকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারে নি। সকলের ইচ্ছা নাগডাণ্ডায় না থেমে একেবারে খারে চলে যাওয়া।

সাথীদের ইচ্ছা কিন্তু ভিন্ন। তারা চায় এখানেই রাত কাটাতে। আর এই দোকানেই। পরে বিক্রমের কাছেই কারণটা জেনে ছিলাম। এই দোকানটা নাকি শের বাহাদুরের ভাইপোর।

নাঃ, আর বসে থাকা ঠিক হবে না। এগোতেই যদি হয় বেলা আর বেশী নেই।

চলার পথে নাগডাণ্ডার অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হলাম।

সারি সারি পাহাড়ের মাথা কেটে তারি সমতল উপত্যকায় নাগডাণ্ডার অবস্থান। প্রচুর ঘরবাড়ী অফিস ইস্কুল দোকানপাট। বেশ সমৃদ্ধশালী গ্রাম। গ্রামের সর্বত্র বিরাজ করছে পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ। লোকজনের অবস্থাও মোটামুটি সচ্ছল বলেই মনে হ'ল।

নাগডাণ্ডার আয়তন দৈর্ঘে কয়েক কিলোমিটার কিন্তু প্রস্থে সামান্য। তাই চলার পথে দু'পাশে দীর্ঘ ঢালু উপত্যকা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

আঁকাবাঁকা মসৃণ পথে এগিয়ে চলি। চোখের সামনে বহুদূরব্যাপী পাহাড়ের গায়ে জড়ানো পথ। দু'পাশে সারি সারি ঘরবাড়ী।

দু'পাশে বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল উপত্যকা। তারি প্রান্তে পর্বতমালার সুদীর্ঘ ঢেউ খেলানো প্রবাহ। পর্বতশীর্ষে কোথাও বা শুভ্র মেঘ পুঞ্জের আবরণ। আবার কোথাও স্খলিত মেঘের ওড়নার ফাঁকে দৃশ্যমান তুষারশৃঙ্গ।

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। ঐ দূরে পোখরার সেই বিখ্যাত তাল, ফেউয়াতাল। টলটলে জল সূর্যকিরণে চিকচিক

করছে। তাছাড়া সমগ্র উপত্যকায় নীলে শ্যামলে, মাখামাখি। সবুজ প্রান্তরের পাশে উজ্জ্বল নীল ফেউয়াতাল।

বিক্রমের ডাকে অন্যদিকে ফিরে তাকাই। এ আরেক অপরূপ দৃশ্য। অন্নপূর্ণা গিরিশৃঙ্গ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গিরি-সৌন্দর্যের প্রতীক। দু'চোখ ভরে দেখি। আর সঙ্গীদেরও দেখাই। দেখতে দেখতে পথ চলি।

শের বাহাদুর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে যেতেই বাঁদিকে সরু একফালি পথ দেখিয়ে বলে,—ও পথেও পোখরা নেমে যাওয়া যায়। শরণ কোট হয়ে বিন্দুবাসিনী মন্দিরের পাশ দিয়ে। অবশ সে পথ আমাদের আসা পথের মত অত সহজ নয়। তবে দূরত্ব তুলনায় কম।

চলতে চলতে আকাশ পানে তাকাই। ক্রমশঃ মেঘ জমছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলল। হয়ত আবার বৃষ্টি আসবে। বিক্রম বাহাদুর তাড়া লাগায়। আকাশের যা অবস্থা যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। তাছাড়া খারে পৌঁছতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। ৪ কিঃ মিঃ পথ। অতএব আর কথা নয়, কোনদিকে তাকানোও নয়। শুধু সামনে নজর রেখে একদৃষ্টে পথ চলা।

শের বাহাদুর এগিয়ে গেছে। বলে দিয়েছি, তাড়াতাড়ি পৌঁছে একটা ভাল আস্তানা খুঁজে নিতে। আমরা যেন একেবারে ডেরায় গিয়ে থামতে পারি।

নাঃ, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা গেল না। প্রথমে ঝির ঝির করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বেশ জোরেই নামল। সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। দ্রুত হাঁটবারও উপায় নেই। জায়গায় জায়গায় শুধু মাটি। পা রাখা যাচ্ছে না। স্লিপ্ করছে।

অদূরে বেশ কয়েকটা ঘরবাড়ি দেখা যাছে। বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করতেই বললে—হ্যাঁ, ওটাই খারে গ্রাম। তবে আমাদের আরো এক কিলোমিটার হাঁটতে হবে। শেষ বাহাদুর যেখানে ব্যবস্থা করবে

সেটা প্রায় গ্রামের শেষ প্রান্তে। মনে মনে বিরক্ত হই। ভাবি এ বৃষ্টির মধ্যে কাছাকাছি একটা আস্তানা যোগাড় করে নিলেই তো হোতো। এই ঝড় জল কাদায় তার পছন্দমত জায়গায় টেনে নিয়ে যাবার কি দরকারটা ছিল!

বিক্রম অবশ্য স্বীকার করল, এখানে ভাল জায়গা মেলাও দুষ্কর। নাগডাণ্ডার তুলনায় জায়গাটাও ছোট। তাছাড়া যাত্রীরা সাধারণতঃ নাগডাণ্ডাতেই রাত কাটায়। তাই সেখানে বেশ কয়েকটা ভাল আস্তানা রয়েছে।

যাইহোক, এসে যখন পড়েছি তখন আর নাগডাণ্ডার সুখ স্বপ্নে লাভ নেই। এখানে একটা তুলনায় ভাল আস্তানা পেলে বাঁচি।

বৃষ্টির বেগটা কমেছে। এখন টিপ টিপ করে পড়ছে। তবে হাওয়ার বেগ কমেনি। তাই কাঁপুনিও ছাড়ছে না।

গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। দুদিকে ঘরবাড়ী। বেশীর ভাগ কাঁচা। কচিৎ দু একটা পাকা বাড়ী নজরে পড়ল। নাগডাণ্ডার তুলনায় দারিদ্র্যের ছাপ প্রখর। চারিদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আনাচে কানাচে স্তূপীকৃত ময়লা আবর্জনা জল কাদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। বেশীর ভাগ ঘরে এবং দাওয়ায় হাঁস-মুরগী গরু ছাগলের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান। তবে মাঝে মধ্যে দু'একটা পরিষ্কার ছিমছাম বাড়ীও নজরে পড়ল। বাড়ীর অবস্থা ভাল না হলেও পরিবেশটা ভাল। বুঝলাম, এটা ঠিক আর্থিক সচ্ছলতার জন্য নয়। নিছক রুচির প্রেরণায় সম্ভব।

ঐ তো এসে গেছি। শের বাহাদুর বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কাছে যেতেই দেখি ভিতরের বারান্দায় কাঠের উনুনের চারিদিকে আমার দলের সবাই আগুন পোহাচ্ছে। ঘরের মধ্যে পা দিতেই লক্ষ্মীনারায়ণ সাদর আহ্বান জানায় অগ্নি সেবনে যোগ দিতে।

বর্ষাতি খুলতেই বুঝতে পারলাম জলে ভেজার পরিমাপটা।

ভেবেছিলাম আপাততঃ জুতোমোজা বড়জোর প্যান্টটা পাল্টালেই চলবে। এখন দেখছি পুরো একসেট শুকনো পোশাক দরকার।

জামা কাপড় পাল্টে উনুনের ধারে গিয়ে বসলাম। দিদি সঙ্গে সঙ্গে চা নিয়ে হাজির।

বড় সহরাঞ্চল ছাড়া নেপালের সর্বত্রই হোটেলের পরিচালনার দায়িত্ব মেয়েদের হাতে। তাদের সম্বোধন করার ঐ একটা মাত্র নাম—দিদি। অন্যের দেখাদেখি আমরাও তাই সম্বোধন করতে শুরু করেছি। তাও বাঙালীসুলভ মিষ্টতা মিশিয়ে।

শের বাহাদুরের নজর আছে বলতে হবে। তাছাড়া আমাদের রুচিটা সে মোটামুটি ধরতে পেরেছে মনে হ'ল। যাইহোক, এ আস্তানাটা থারে গ্রামের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে ভাল। বাড়ির মালিক কল বাহাদুর যাত্রীদের সুবিধার জন্য সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই রেখেছেন। তবে সর্বোপরি বাহাদুর গিন্নী দিদির আতিথেয়তা এবং সেবাযত্ন ভুলবার না।

হ্যালো—ডাক শুনে বাইরে বারান্দার দিকে তাকাই। দেখি সদলবলে ঢুকছে ক্যালিফোর্নিয়ার সেই শিশু বিশেষজ্ঞ—ডাঃ রিচার্ড রীপার। আশ্চর্য হয়ে দেখি সঙ্গে প্রায় ৫।৬ জন কুলী। সঙ্গে প্রচুর মালপত্র। কি ব্যাপার? একটা লোকের এত কুলী এত মালপত্র—? তবে কি দুর্গম কোন গিরিশিখর বিজয়ে চলল? আশ্চর্য হয়ে নিজেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

একজন মাত্র খদ্দেরের এত আড়ম্বর দেখে দিদিও খানিকটা বিচলিত। তাছাড়া সাহেব খদ্দের। প্রাপ্তিযোগটাও তুলনায় ভাল হবে। তাড়াতাড়ি একপাশে একটা তক্তাপোশের উপর একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে সাহেবের বসার জায়গা করে দিল।

উনুনের ধার থেকে ঘরের মধ্যে উঠে এলাম। ততক্ষণে সাহেবও পোশাক পাল্টে কম্বলের উপর জাঁকিয়ে বসেছে। রিচার্ড যাবে অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প। যাতায়াতে ৬।৭ দিন লাগবে। ওপথে

চন্দ্রকোট এবং সুমলে ছাড়াকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কথা বলে দেখলাম রিচার্ড একটু সৌখীন এবং আরাম প্রিয়। তাই সবরকম খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে চলেছে। ময়দা মাখন চিনি থেকে সুরু করে জ্যাম জেলী ফ্রুটস জুস্। তিনজন কুলী এসব সঙ্গে নিয়ে চলেছে। তাছাড়া একজন পাচক ও একজন গাইড।

এমন সময় পাচক কফি নিয়ে এল। আমাকেও একগ্লাস নিতে হ'ল। ওদের সকলের খাবারের ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করে নিচ্ছে। শুধু দু'একটা বাসনপত্র দিদির কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে। রিচার্ডের লোকজন রাত্রে দিদির আস্তানায় থাকলেও রিচার্ড কিন্তু পাশেই রাস্তার ধারে একফালি সবুজ মাঠের উপর তাঁবু খাটিয়ে থাকবে। নিচে পাতার মত ডানলোপিলোর সিটও সঙ্গে এনেছে। ঘরে জায়গা থাকতে বাইরে শোওয়া কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বললে—এটা ওর কাছে এক ধরণের আনন্দ। তাঁবুতে রাত না কাটালে ট্রেকিং এর পুরো আনন্দ, মর্য্যাদা বজায় থাকে না। তাই সে ঠিক করেছে পোখরা থেকে যাত্রা শুরু করে আবার পোখরায় না ফেরা পর্যন্ত সে তাঁবুতেই রাত কাটাবে। তারপর হেসে বললে—ভ্যাখ, আমরা আমেরিকানরা সব সময় বাঁধা ধরা নিয়মে চলতে ভাল বাসি না। মাঝে মধ্যে কিছু অনিয়ম কিছু ব্যতিক্রমের আকর্ষণ এড়াতে পারি না। তাই জুমসুমের পথে যাব ঠিক করেও হঠাৎ মত পাল্টে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের পথ ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক করলাম ঘরে নয়, মুক্তাঙ্গনে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস করব। ছেলেমানুষের মত আরো অনেক কথাই বলে চলল রিচার্ড।

আমার কাছে ছেলেমানুষ বৈকি! বয়স আর কত হবে! বড়জোর ৩২।৩৩।

বরাবর শহরে মানুষ। শৈশবে মা বাবার সঙ্গে নিউইয়র্কে। তারপর চাকুরী জীবনে ক্যালিফোর্নিয়ায়। তাই জনারণ্য এবং কোলাহল থেকে বছরের কয়েকটা দিন হলেও সে নির্জনে কাটায়।

হয়ত দেশে কোন নির্জন গ্রাম্য পরিবেশে কিম্বা সমুদ্র সৈকতে নয়ত বিদেশের কোন শান্ত সুন্দর প্রকৃতির কোলে। মা বাবার প্রসঙ্গ উঠতেই তাঁদের বর্তমান ঠিকানা জিজ্ঞাসা করি।

রির্চাডের মা নেই। ইনি সৎমা। নিজের মায়ের প্রসঙ্গে বলল—সী ইজ লষ্ট। তার মানে? রির্চাড একটু থেমে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল। বুঝলাম কোথাও যেন একটা ব্যথা রয়েছে তার মনে। তাই সে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইছে।

রির্চাডের বাবা জন রীপার ছিলেন দুর্ধর্ষ আর্মি জেনারেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওয়েষ্টার্ন এশিয়ায় বহু ফ্রন্টে লড়াই করেছেন। এখন তিনি হাওয়াই দ্বীপে স্থায়ীভাবে বাস করছেন।

আর্মি থেকে রিটায়ার করে জন রীপার দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন আর্মি হাসপাতালের এক নার্সকে। নাম লিসিকা।• উভয়ের মধ্যে বয়সের বিরাট ফারাক। কম করে পঁচিশ বছর। অবশ্য ওদের সমাজে বয়সের পার্থক্যটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এমনকি এই ফারাক যদি উল্টো দিক থেকেও হয় তবুও না। কথার মাঝখানে আমি আবার ওর নিজের প্রসঙ্গে চলে আসি—আচ্ছা তুমি নিজে বিয়ে করছ না কেন? আমার কথা শুনে শুধু একটু হাসল সে। পরে ধীরে ধীরে বলল—বন্ধনকে আমি ভয় পাই।

—তোমাদের সমাজে বন্ধন হলেও সে তো ফস্‌কা গেরো। যখন ইচ্ছা খুলে ফেলা যায়।

—তা ঠিক। তবে সব মানুষতো সমান নয়। আমাদের সমাজে তোমাদের মত অনেক পরিবার আছে যারা সুশৃঙ্খল শান্ত জীবন যাপন করতে ভালবাসে। ধরতে পার আমিও অনেকটা সেই দলে।

—বেশ তো, দেখে শুনে সেরকম একটা পাত্রী যোগাড় করলেই তো হয়।

সেটাকি অত সহজ? তাছাড়া ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে?

—সেটা তো ভাগ্য। পুনরায় হাসিমুখে বলে,—দরকার কি অসহায়ের মত ভাগ্যের উপর নির্ভর করা। বেশ তো আছি। তাছাড়া আমার যা কাজ তার মধ্যেও বাঁচার যথেষ্ট আনন্দ রয়েছে।

—কি রকম?

আমি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। আমার কাজ ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের শরীর পরীক্ষা করে দেখা। সারাদিন ওদের নিয়ে আমার বেশ ভালই কাটে। তাছাড়া আরো একটা আনন্দের উৎস আছে আমার।

—কি সেটা?

—হাওয়াইতে আমার একটা ছোট্ট বোন আছে, লিলি। বছর দশ বয়স। একদিন অন্তর সে আমাকে চিঠি লেখে। আমাকেও ঠিক সময়ে উত্তর দিতে হয়। উত্তর পেতে দেরী হলে কারো সঙ্গে কথাও বলবে না, খাবেও না, স্কুলেও যাবে না। বল দেখি কি ক্যাসাদ। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মনে হল রিচার্ডের চোখটা যেন ছল ছল করছে। —আরো কি জান, চিঠি না দিলে পোষ্টম্যানকেই ধমকাবে। অপরাধটা যেন তার। পোষ্টম্যানও এখন বুঝে গেছে। সেও অপরাধ স্বীকার করে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে—বড্ড ভুল হয়ে গেছে দিদিমণি, আর এমনটি কখনো হবে না। এরকমই যথারীতি চলতে থাকে।

তবে এটাও ঠিক, বিকেলে বাড়ী ফিরে বোনটার চিঠি না পেলে আমারও ভাল লাগে না। মনে হয় আজকের দিনটা যেন বৃথা।

রিচার্ডের কাহিনী শুনতে শুনতে আমি যেন তন্ময় হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে এ যেন বাংলা উপন্যাসের কোন আত্মভোলা নায়কের জবানীতে আত্মকথা শুনছি।

—আচ্ছা তোমার সৎমা,—কথা শেষ করার আগেই রিচার্ড খেই ধরে নিল। —আমার সৎমা লিসিকা মানুষটা খুব ভাল। সব সময় হাসিখুসী এবং হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে থাকতেই ভালবাসে।

হাওয়াই দ্বীপের উত্তাল জীবন ধারার মূর্ত প্রতীক আমার এই ছোট্ট মা'টি।

—ছোট্ট মানে ?

—বাঃ, বয়সে আর কত বড়! বড়জোর ৩৪ বছরের। তবে মা হলে কি হবে। এই বুড়ো ছেলেকে ভালওবাসে আবার ভয়ও করে। বোনটার জন্য বছরে দু'বার আমাকে হাওয়াই দ্বীপে যেতে হয়। যতদিন সেখানে থাকি ততদিন লিসিকা মা অন্য মানুষ। লিলি বলে, জান দাদা মা তোমাকে ভয় করে। তুমি বাড়ী এলে মা গানও করে না আর আমাকেও একদম বকে না। বলে—শোন খুকী আমি যে তোকে বকি আর নাইট অপেরায় যাই একথা রিচার্ডকে কখনো বলিস না। লক্ষ্মী মেয়ে এবার তোকে একটা ঢাউস্ কোরিয়ান পুতুল কিনে দেব।

মায়ের হাবভাব দেখে বাবা কত ঠাট্টা করেন। মা মনে মনে লজ্জা পেয়েও হাসি মুখে বলে—অতবড় ছেলের মা হওয়া কি সোজা কথা ? অনেক সংযত হয়ে চলতে হয়। সব সময় ধেই ধেই করে নাচলে লোকেই বা বলবে কি, আর ছেলেই বা কি মনে করবে ? তাছাড়া তোমার যা পাকা মেয়ে। এতেই আমার ভয় করে ছেলের সামনে কখন বেফাঁস কি বলে বসে। বলতে বলতে রিচার্ড হঠাৎ থেমে যায়। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবে। হয়ত মনের কোণে ভেসে উঠে সাগর পারের সেই ছোট্ট বোনটির স্মৃতি। নয়ত ছোট্ট এক মায়ের প্রাণঢালা ভালবাসার প্রতিবেদন। আমার মুখেও কথা নেই। এই মুহূর্তে বলার মত কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছি না। তবুও একটা কথা না বলে থাকতে পারলাম না। কথাটা হয়ত রূঢ়ই শোনাবে। ইতস্ততঃ করেও বলে ফেললাম। তোমাদের পাশ্চাত্য সমাজে সংসার কথা ছেড়েই দিলাম ভাইবোন মা বাবার সঙ্গে ক'জনেরই বা সম্পর্ক থাকে। তোমার ব্যাপারটা যতটুকু শুনলাম মনে হচ্ছে তুমিই তোমার তুলনা।

—তোমার কথা আমি মোটেই অস্বীকার করছি না। আমাদের সমাজে একটু সাবালক হলেই আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ি। আবার আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডীও তোমাদের তুলনায় সংকীর্ণ। তোমাদের আত্মকেন্দ্রিকতার কেন্দ্র স্বামী-স্ত্রী ছেলে মেয়ের একটা ছোট্ট সংসার। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকেও বাহুল্য ভাবে। তাদের সবকিছু শুধু আপন আত্মার সুখ দুঃখ ভালমন্দকে কেন্দ্র করে। তা না হলে তুচ্ছ কারণে এত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারত!

—সেদিক থেকেও তোমার মা বাবা কিন্তু সুখী। বয়সের এত ফারাক থাকা সত্ত্বেও।

—প্রধান কারণ কিন্তু আমার সৎমা। ওরকম মহিলা আমাদের সমাজে বিরল। হাওয়াই দ্বীপের উদ্দাম জীবনযাত্রার খবর তোমরাও নিশ্চয় রাখ। সেখানে আমার ঐ কচি মা'টি বুড়ো স্বামী আর প্রবাসী বুড়ো ছেলের ভাবনা নিয়েই অস্থির। নিজের যা কিছু সখ সাধ, তাও রেখে ঢেকে মেটায়। সখ-স্বাদ বলতে একটু ঘন ঘন অপেরায় যেতে ভালবাসে। তাও আমি বাড়ী থাকলে ভুলেও ওপথ মাড়াবে না। আমার বড় কষ্ট হয়, তাই আমিই উদ্যোক্তা হয়ে সবাইকে নিয়ে যাই। লিসিটাও বড় হ'লে মায়ের মত হবে। আমার কি ইচ্ছা জান, লিসিটা বড় হলে একটা ইণ্ডিয়ান ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। তোমরা স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে ভালবাস। লিসি জীবনে কষ্ট পেলে আমাদের কারো সহ্য হবে না। আমাদের স্বদেশী ছেলেদের মোটেই বিশ্বাস নেই। স্থায়ী দাম্পত্য জীবন আমাদের মধ্যে দুর্লভ।

—সে ভয়ে তুমি বিয়ে করছ না? আমার কথায় রিচার্ড হেসে ফেলল। বললে, —পুরোটা না হলেও কিছুটা বটে।

—সেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া?

—নয়ত কি? তখন কি আর মা বাবা বোনকে নিয়ে সুখস্বপ্ন দেখার ফুরসৎ পাব? ওরাও আমার কথা ভেবে সঙ্কোচে দূরে সরে যাবে। বিশ্বাস কর, সে রকম হলে আমি কিন্তু মোটেই সহ্য করতে

পারব না। আমার নিজের মায়ের কথা আমার মনে নেই। বেঁচে থাকলেও এর চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কি পেতাম।

—তা নয় বুঝলাম; কিন্তু মানুষের জৈবিক তাড়নাওতো একটা থাকে। সেক্ষেত্রে—। কথার মাঝখানেই রিচার্ড হো হো করে হেসে উঠল। তারপর সলজ্জ ভঙ্গিমায় বলল—তার জন্যে বিয়ে করার কি দরকার? আমার কাছে কথাটার গুরুত্ব কতখানি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বললে—কিছু মনে করো না, এ ব্যাপারে তোমাদের আর আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। মাঝখানে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর।

আমিও প্রসঙ্গ পাল্টে বলি—তোমার কথা শুনে তোমার মা আর বোনকে একটিবার দেখতে ইচ্ছে করছে। তোমার দেশে যাওয়ার সৌভাগ্য যদি কোনদিন হয় তাহলে দেখা হলেও হতে পারে, কি বল?

—এতে আর বলার কি আছে? আমার ঠিকানাটা লিখে রাখ। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আমার ডায়েরীতে খস্‌খস্‌ করে লিখে দিল—ডাঃ রিচার্ড রীপার, ২৭৪০ সেকেণ্ড স্ট্রীট, সান্তামোনিকা, ক্যালিফোর্নিয়া। ইউ এস এ—৯০৪০৫। যাবার আগে চিঠি লিখো, আমি বিমান বন্দরে হাজির থাকব।

—অসংখ্য ধন্যবাদ।

—দাঁড়াও। হঠাৎ রিচার্ড উঠে গিয়ে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ বার করে নিয়ে এল। —তুমি আমার ডবল এল্‌ কে দেখবে?

—ডবল এল্‌?

—হ্যাঁ, মাই মাদার এণ্ড সিসটার। লিসিকা এণ্ড লিলি। প্লাষ্টিকের ছোট একটা জোড়া জ্যাকেটে মা আর বোনের ছবি।

ভারী মিষ্টি একজোড়া মুখ। আচমকা দু'টো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—হাউ নাইস। আমার উচ্ছ্বাস দেখে রিচার্ডের চোখে মুখেও আনন্দের উচ্ছলতা।

রিচার্ডের মা বোনের ছবি আমার দলের সকলের হাতে হাতে

একবার ঘুরে এল। প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় বলি—ত্যাখো রিচার্ড, আমি যদি ঔপন্যাসিক হতাম তোমাকে নিয়ে একটা যুৎসই উপন্যাস লিখে ফেলতাম। অবশ্যই বাংলা ভাষায়। বাংলা উপন্যাসে নায়ক হবার মত যথেষ্ট উপকরণ তোমার মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বিশেষ অনুকূল।

—লিখলেই পার। তাছাড়া শুনেছি তুমিও একজন লেখক।

—হ্যাঁ লেখক—। তবে আমি লিখি প্রধানত চোখ দিয়ে। দৃশ্যমান সত্য নিয়েই আমার কারবার। ঔপন্যাসিক হ'লে তোমাকে নিয়ে কল্পনার রসসৌধ তৈরী করে ফেলতাম।

রিচার্ড প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—কল্পনা কেন? আমার সব কিছু'তো বাস্তবই। তা হলে তোমার অসুবিধাটা কোথায়? তাছাড়া শুনেছি তুমি নাট্যকারও। নাটকের কাঠামোয় অনায়াসে আমাদের ধরে রাখতে পার।

—তা পারি। তবে নাটকের তুলনায় পাঠকের সংখ্যা আমার ভ্রমণ সাহিত্যেই বেশী। পৈতৃক নামে আমার ৪।৫ খানা নাটক বাজারে বেরিয়েছে। তবে ছদ্মনামের ভ্রমণ সাহিত্য তুলনায় বেশী সমাদৃত। তাই আমার ইচ্ছা বহুর মধ্যেই তোমাকে প্রকাশ করি।

বহুদিন পর আজ লিখতে বসে সেই ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে পেরে আমি ধন্য হলাম। অনেকে হয়ত বলবেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন? আমার বিশ্বাস আমার এ অত্যাচারটুকু আপনারা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন। আমার এ প্রত্যয়ের মূলে রয়েছে এক সর্বজনীন অনুভূতি। প্রকৃতির নন্দনকাননে ভ্রমণরত সহযাত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের সত্য সুন্দর ভগ্নাংশও ভ্রমণ সাহিত্যিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলে।

সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্ন করে হঠাৎ মঞ্চে দিদির আবির্ভাব ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে সদর্প ঘোষণা—খানা রেডি—। বলামাত্র যবনিকা পতন। পর্দা নেমে এল। আলোচনার প্রেক্ষাপট মুহূর্তে ঢাকা পড়ল।

॥ তের ॥

ভোর হতেই আবার চলা সুরু। রিচাড তখনও ঘুমোচ্ছে। একটা হাঁক দিতেই তাঁবুর বাইরে চলে এল। ধন্যবাদ বিনিময় শেষ করে আমরা এগিয়ে চললাম। রিচাডের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হবে না। আমাদের পথে সে লুমলে, চন্দ্রকোট পর্যন্ত যাবে। তারপর অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের পথে কাণ্ডিপাসের দিকে এগোবে।

চলতে চলতে ভাবি আর আশ্চর্য হই। কি বিচিত্র এই সংসার। ক্ষণিকের দেখা একজন বিদেশী। তার জীবনের এক টুকরো মধুর স্মৃতি বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে গেঁথে রইল মনে। এ স্মৃতি ভুলবার নয়। এ যে চলার পথের অমূল্য সঞ্চয়। এ সঞ্চয়ের উপস্বত্ব সারাজীবন ভোগ করে যাব। যে কোন মুহূর্তে ইচ্ছা হলেই দেখতে পাবো ক্যালিফোর্নিয়ার একজন নিঃসঙ্গ ডাক্তার কোন মায়াবলে জীবন সমুদ্রের দুর্গম তলদেশ থেকে বেঁচে থাকার মহৌষধি আহরণ করে এনেছে। সে মোটেই আত্মকেন্দ্রিক নয়। অমৃতময় মহৌষধি সেতো আমাকেও খানিকটা দিয়ে গেছে। তাইতো সে আমার কাছে দূরের কেউ নয়। একান্ত আপনার। মনে পড়লেই ভেসে ওঠে একটা মাত্র প্রেক্ষাপট। তাতে পাশাপাশি অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে ক্যালিফোর্নিয়া-নেপাল-কোলকাতা-হাওয়াই প্রশান্ত মহাসাগর। আর আছে জন, লিপিকা, রিচার্ড, লিলি আর এই নগণ্য লেখক। আর পটে যে রঙের খেলা সেতো মধুর স্নেহ ভালবাসার ক্ষরিত নির্যাস।

ওসব চিন্তা এখন থাক। আবার চলার পথে ফিরে আসি। অন্যমনস্ক হলে পথ হারাবার ভয়। তাতে অশেষ দুর্গতি। ভয় নেই শুধু স্মৃতিপটে পথ হারালে, যেখানে যখন খুশী যাও। নিশ্চিন্তে হারিয়ে যাও কোন বিপদ নেই। একসময় বাস্তব টেনে নামাবেই।

ছেলের ডাকে থামতে হল। পথের ধারে এক রুটির কারখানার

সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। বিক্রম বলেছে নেপালের 'ভুনটু' রুটি নাকি খুব উপাদেয়। ঘি ময়দা ডিম চিনি দিয়ে তৈরী। একটা এক মোহর। অর্থাৎ নেপালী আধুলি। সবে নামানো হয়েছে। এরকম রুটি আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। দেখতে অনেকটা টেনিকট রাবার রিঙের মত। খেতে বেশ ভালই লাগল।

গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। থারের সীমানা কোথায় জানি না। তবে রাস্তার দু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরবাড়ী। অপ্রশস্ত পাহাড়ের ঢালে সবুজ শস্যক্ষেত। পাহাড়ের গায়ে এবং নিচু উপত্যকায় চড়ে বেড়াচ্ছে গরু মোষ ছাগল ভেড়ার পাল।

পথ প্রায় সমতল। তাই চলায় তেমন ক্লান্তি নেই। মনে হয় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি। চলতে চলতে এবার আরেকটা গ্রামে প্রবেশ করলাম। থারের তুলনায় সমৃদ্ধই মনে হল। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সুসজ্জিত ঘরবাড়ী। চারিদিকে স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ। গ্রামটির নাম লুমলে। আয়তনে খুব একটা বড় না হলেও বেশ জমজমাট।

লুমলের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে খানিকটা এগোতেই শুনলাম চন্দ্রকোট গ্রামে এসে পড়েছি। সুদীর্ঘ এক গিরিশিরার শেষ প্রান্তে এই গ্রাম। সুঁইক্ষেতের পর নাগডাণ্ডা থেকে যে গিরিশিরার সুরু, এই চন্দ্রকোটই তার শেষ প্রান্ত সীমা।

ডাঃ রির্চাড এই চন্দ্রকোট থেকেই নতুন পথ ধরবে। ডানদিকে যে পথটা নেমে গেছে সে পথে এগিয়ে যাবে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের দিকে। আমরা যাব সোজাপথে বীরেথান্টির দিকে।

চন্দ্রকোট গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা বাড়ীর দাওয়ায় চায়ের সরঞ্জাম দেখে দলের সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। শের বাহাদুর বললে— যদি কারো চা খেতে ইচ্ছে হয় এখানে খেয়ে নিন। বহুদূর আর কিছু পাওয়া যাবে না। পথ ও দুর্গম। তীব্র উতরাই।

চায়ের কথা বলতে হ'ল না। আমাদের থামতে দেখেই দোকানের কর্ত্রী চা তৈরী সুরু করে দিয়েছে। হয়ত শের বাহাদুর ইশারায়

গ্রীণ সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে।

চা পর্ব শেষ করে এগিয়ে চললাম। খানিকটা এগোতেই দেখলাম উতরাই পথের সুরু। জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে পথ ক্রমশঃ নেমে গেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে সঙ্কীর্ণ পথ। ছোট বড় পাথরের অসম ধাপ। প্রতি মুহূর্তে পা ফস্‌কে পড়ে যাবার ভয়। কোন কোন জায়গায় বর্ষার ক্ষত এখনো রয়েছে। সে সব জায়গায় একদম বসে পড়ে পা আগে বাড়িয়ে অতি কষ্টে নেমে যেতে হচ্ছে। অনেকে মনে করেন যত কষ্ট শুধু চড়াই পথে। এ ধারণা কিন্তু ভুল। উতরাই পথ আরো বিপজ্জনক। আবার যদি পাথুরে অসম ধাপ বেয়ে নামতে হয় তো সোনায় সোহাগা। যাই হোক সাবধানে ধীরে ধীরে নেমে চলি। পথ যেন ফুরোতে চায় না। নীচে নদী প্রবাহ দেখা যাচ্ছে। আমাদের সেখানেই নেমে যেতে হবে। দেখে মনে হয় প্রায় এসে গেছি। আর কিছুটা নেমে গেলেই নদীতীরে পৌঁছে যাব।

বিক্রমের কথায় সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বললে—ওখানে পৌঁছতে এখনও পৌণে একঘন্টা লাগবে। বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। যাক, সে ভেবে কি লাভ। পৌঁছতে যখন হবে সময়ের ভাবনা নিরর্থক। অতএব চল এগিয়ে চল। তবে সাবধানে পায়ে পায়ে।

অতিকষ্টে নদীতীরে নেমে এলাম। দু'পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। বিশেষতঃ হাঁটুর মালাইচাকিতে। এবার কোথাও একটু বসে বিশ্রাম নিতে হবে। শের বাহাদুরকে বললাম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই যেখানে ডেরা মিলবে সেখানেই যেন খাবারের ব্যবস্থা করে নেয়। বেলা এখন সবে সাড়ে দশটা। দুপুরের খাবার সময় এটা নয়। তবে খাবার তৈরী হতেও ঘন্টাখানেক সময় লাগিবে। তাছাড়া বিশ্রাম যখন নিতেই হচ্ছে খাওয়াটাও না হয় দুদণ্ড আগেই সেরে নেবো।

শের বাহাদুর ঠিক ব্যবস্থাই করেছে। প্রথম ঝোলা ব্রীজ পার

হয়ে বাঁক নিতেই দেখলাম সামনেই একটা দোকান। দোকানের লাগোয়া একটা ঘরের বারান্দায় টেবিল চেয়ার পাতা। একটা ঘর সমেত ঐ বারান্দাটা যাত্রীদের খাওয়া থাকার জন্যই ব্যবস্থা করে রাখা। নেপালী এক সুন্দরী যুবতী দোকান এবং হোটেল উভয় দিক সামলাচ্ছে। ডান হাতে চটকদার ঘড়ি। দামী পোশাক পরণে। এলোচুল, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। অনর্গল ভাঙা ইংরেজীতে ট্যুরিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। যখন ভাষায় কুলোচ্ছে না, তখন শারীরিক প্রক্রিয়ায় বুঝিয়ে দিচ্ছে।

নেপালের বিভিন্ন পথে পরিক্রমাকালে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে ব্যবসা চালাবার সুনিপুণ বিচক্ষণতায় নেপালী মেয়েরা অদ্বিতীয়। ব্যবসার যেটা প্রধান অঙ্গ মিষ্টি মুখের মধুর হাসি জড়ানো কথাবার্তা, নেপালী মেয়েরা হয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। নয়ত উপযুক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে আয়ত্ত করে নেয়।

এই মেয়েটির নাম উর্মিলা। বয়স কত ঠিক আন্দাজ করা গেল না। মনে হয় কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে। একবার বাইরে দোকান সামলাচ্ছে আবার ভিতরে গিয়ে রান্নার তদারকি করছে। আবার রাস্তার দিকেও নজর রয়েছে। ট্যুরিষ্ট দেখলে হাসিমুখে আমন্ত্রণ ও জানাচ্ছে। মেয়েটার অনলস কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হলাম।

বেলা ১২টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার তৈরী হয়ে নিলাম। বিকালের মধ্যে আমাদের তিরকেধুঙ্গা পৌছতে হবে। সেখানেই হবে আজকের মত যাত্রা বিরতি।

এই লোকালয়ের নাম বীরেথান্টি। চন্দ্রকোটের পরবর্তী গ্রাম এটি। গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ বলেই মনে হল। বসতি যাই থাকনা কেন বেশ কয়েকটা ভাল হোটেল রয়েছে দেখলাম। তবে সব কটি হোটেলই ঘরোয়া পরিবেশে। ট্যুরিষ্টদের রুচি ভেদে সব রকমের খাবারের ব্যবস্থা আছে। তৎসহ পানীয়েরও। চলার পথে বীরে থান্টির হোটেলগুলোতে অনেক বিদেশী ট্যুরিষ্ট নজরে পড়ল।

মোতি নদীর ধারে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে, এই গ্রামটির অবস্থান। বাড়ীর উঠোনে বা আশেপাশে ফল ফুলের বাগান। কোথাও বৃক্ষলতাচ্ছাদিত ছায়া ঘেরা পরিবেশ আবার কোথাও রৌদ্রকরোজ্জ্বল উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তর। যাত্রীদের কেউ বা বসে আছে সুশীতল ছায়া ঘেরা নদী তীরে, কেউ বা গা এলিয়ে রৌদ্র স্নানে রত। মনে হয় প্রকৃতি প্রেমে ওরা আটকা পড়েছে।

আমরা যাত্রী হলেও মূখ্যতঃ তীর্থযাত্রী, তাই এ যাত্রা প্রকৃতির মোহময় আকর্ষণ উপেক্ষা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পৌঁছতে হবে সেই দুর্গম প্রান্তে সেই দেবালয়ে। যেখানে অবস্থান করছেন আমাদের প্রাণের ঠাকুর। ঈপ্সিত দেবতা, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা ঘর ছেড়ে পথে নেমেছি।

'জয়বাবা মুক্তিনাথ' ধ্বনি তুলে আবার যাত্রা সুরু করি। আরেকটা ঝোলানো পুল পেরিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে চলি। এখানে দেখলাম মোতি নদীর সঙ্গে আরো একটা নদী প্রবাহ মিশে সঙ্গমের সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি এসে পিছন দিকে তাকাই। কি অপরূপ প্রার্কৃতিক দৃশ্য। মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। পাহাড়ের ধাপে ধাপে ঘরবাড়ী, সঙ্গে ফালিফালি ফল ফুলের বাগান। পদতলে ছায়া ঘেরা নদী সঙ্গমে উত্তাল তরঙ্গমালা। একপাশে ঝোলা ব্রীজ নদী-কণ্ঠ-মালার প্রতীক। উজ্জ্বল সূর্যালোকে বীরেথান্টির অপরূপ অঙ্গ সজ্জায় মুগ্ধ হলাম।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। তাই এই ভর দুপুরে রোদের তেজটা গায়ে বিঁধছে। বীরেথান্টি ছাড়ার পর পথ কিছুটা চড়াই উতরাই। তবে চড়াই বেশী।

খানিকটা পথ এগোতেই দেখি পথ একেবারে নিশ্চিহ্ন। নদী স্রোত বিরাট খাদের সৃষ্টি করেছে। অগত্যা খাদের দিকে নেমে গেলাম। দূর থেকে দেখি শের বাহাদুর আর বিক্রম জলের ধারে

আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

কাছে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড জলস্রোত। তার উপর দু'দিকে পাথরের উপর দু'তিনটা কাঠ একসঙ্গে বেঁধে সাঁকো তৈরী করা হয়েছে। ওরা দু'জনে আমাদের সকলকে হাত ধরে পার করিয়ে দিল।

এবার পথে পড়ল ছোট একটা গ্রাম, 'মাতা থাঙে'। নামেই গ্রাম। বড়জোর ৫।৬ ঘর বসতি। এর পরের গ্রামটাও একই রকম। সেও ৫।৭ ঘরের বাস। লোকজন ও বড় একটা দেখতে পেলাম না। গ্রামটির নাম লামভার।

এখন পথ মোটামুটি সমতল। পথের দু'পাশে শস্যক্ষেত। তারি মধ্য দিয়ে জলধারা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খানিক দূর যেতেই ছোট আরেকটা গ্রাম—সুদামে।

সকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২।১৩ কিঃ মিঃ হেঁটেছি। এখন বেলা প্রায় আড়াইটে। বিক্রম বললে তিরকেধুঙ্গা পৌঁছতে আরো ঘণ্টা খানেক হাঁটতে হবে।—তা হাঁটতে যখন হবেই তাড়াতাড়ি হেঁটে ফেলাই ভাল,—কি বল বিক্রম সিং। কেউ তো আর কোলে করে এগিয়ে দেবে না। আমার কথায় বিক্রম শুধু হাসে। তারপর বোঝা কাঁধে আগে আগে এগিয়ে চলে।

কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিতেই দেখি দূরে একটা বিরাট গাছের নিচে দলের সদস্যরা বিশ্রাম নিচ্ছে। শের বাহাদুরও বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাছে যেতেই বিশ্রামের হেতুটা বুঝতে পারলাম। দুটো ছেলে ঝুড়িতে করে পেয়ারা নিয়ে বসেছে। চলার পথে খদ্দেরও তাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। বীরেথান্টির সেই উর্মিলা দিদির অন্নজল প্রায় হজম হয়ে এসেছে। তাছাড়া দুপুর রৌদে এতখানি পথ হেঁটে এসে ডাঁসা পেয়ারার লোভ সম্বরণ করা খুবই কঠিন। আমাকেও থামতে হ'ল। পথের পাশেই পাথরের চাঁই দিয়ে সাজানো চওড়া ধাপ। একটানা হাঁটার পর সুশীতল ছায়ায় এহেন পাথরের বেঞ্চিতে একটু বিশ্রাম না নেওয়ার কথা ভাবা যায় না। গ্যাট

হয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। ইত্যবসরে হাতে একটা পেয়ারাও এসে পড়ল।

আহা, কি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া, নিমেষে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। ইচ্ছে হয় আরো দু'দণ্ড অপেক্ষা করি। কিন্তু উপায় নেই। শের বাহাদুর তাড়া লাগায়। দলের সদস্যরা তার নেতৃত্বে আবার চলতে সুরু করেছে। অগত্যা আমাকেও উঠতে হ'ল।

উঠতেই খালি জায়গায় এসে বসল ৪।৫ জন নেপালী মেয়ে পুরুষ। তারাও মুক্তিনাথ যাত্রী। ধুলখেল থেকে আসছে।

দলনেতা কৈলাশ থাপা। ধুলিখেল জায়গাটা কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই কৈলাস ধুলিখেলের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ফেলল।

ধুলিখেল নেপালের একটা প্রাচীন শহর। কাঠমাণ্ডুর তিরিশ কিলোমিটার পুবে। কাঠমাণ্ডু কোডারী সড়ক পথে। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি ভুলবার নয়। ধুলিখেলের পূর্ব পশ্চিমে দিগন্ত ব্যাপী দীর্ঘ গিরিশ্রেণী। এই গিরিশ্রেণীর অপরূপ শোভায় আকৃষ্ট হয়ে বহু হিমালয় প্রেমিক প্রতি বছর সেখানে যায়। আবার অনেকেই এই ধুলিখেল থেকে এক ফাঁকে নেপালের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির নমোবুদ্ধ দর্শন করে আসেন। তাছাড়া ধুলিখেল সংলগ্ন পানাউতি গ্রামে রয়েছে অসংখ্য মন্দির। ও সকল মন্দিরে কাঠের কারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বর্তমান।

কৈলাস থাপাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে চললাম। আমার সঙ্গীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অতএব আমারও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া দরকার।

এখন পথ সামান্য চড়াই উৎরাই। কোথাও বা সামান্য জঙ্গলাকীর্ণ। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে পথ। পথের পাশে কোথাও বা ঝরণাধারার প্রবাহ। আশেপাশে তাকালে মনে হবে সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা পল্লী পরিবেশ। তার উপর অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণঝরা আলোর বিকিরণ। সবকিছু মিলিয়ে যেন এক

মোহময় পরিবেশ। চলার পথে মাঝে মাঝে চারিদিকে তাকাই। প্রকৃতির এই রূপ মাধুর্য চোখের মধ্য দিয়ে মনের মণিকোঠায় পৌঁছে তনুমনে শিহরণ জাগায়।

।চৌদ্দ।

বেলা চারটে নাগাদ তিরকেধুঙ্গা পৌঁছে গেলাম। রাস্তার ধারে একটা জায়গায় উঁচু পাথরের উপর সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে যেতেই গিন্নী চমকে উঠে বলল—তোমার চশমা? চোখে হাত দিয়ে আঁতকে উঠি—সে কি? এখন উপায়? চশমা ছাড়া দেখবো কি করে? আমার অবস্থা দেখে দলের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। মেয়ে বলল বীরেথান্টিতে খুলেছিলে দেখেছিলাম, যখন মুখ হাত ধুচ্ছিলে।

তাহলে তো সেরেছে। চশমার জন্য বীরেথান্টি ফিরে যেতে হলে এযাত্রা কি আর মুক্তিনাথ দর্শন সম্ভব হবে? গিন্নী বললে নাঃ তারপরেও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা লামভারে সুদামে কিম্বা আর কোথাও কি বসেছিলে?

কোথাও বসেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। তৎক্ষণাৎ ছেলে বলে উঠল হ্যাঁ বসেছিলে। যেখানে আমরা সবাই বসে পেয়ারা খেলাম। সবাই একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠলাম হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে পড়ে থাকতে পারে। কে যাবে? বিক্রম একপায়ে খাড়া। নিশ্চয় বকশিসের প্রত্যাশায়। হোলোই বা, ও যদি খুঁজে পায় স্পেশাল প্রাইজ দিতে ও রাজী।

বিক্রমকে পাঠিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। যদি সেখানে না পায়? ইত্যবসরে যদি কেউ তুলে নিয়ে চলে যায়। ছেলেপিলেদের কাছে একটা ভাল খেলার জিনিস তো বটে। কিম্বা এওতো হতে পারে আরো আগে কোথাও ফেলে এসেছি। যদি তাই হয় বিক্রম

যদি খালি হাতেই ফিরে আসে ? আর ভাবতে পারছি না। অথচ সবেমাত্র যাত্রা সুরু। এখনো দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হবে। চশমা ছাড়া একেবারে অসম্ভব। মনে মনে একটা মাত্র ভরসা মুক্তিনাথের কৃপা।

কৈলাসের দল ও এসে পড়েছে। তারাও এখানে রাত কাটাবে। কৈলাসকে জিজ্ঞাসা করলাম পথে ও আমাদের বিক্রমকে দেখেছে কিনা। বললে হ্যাঁ, তাকে দৌড়তে দৌড়তে যেতে দেখেছে। কি হয়েছে জানতে চাওয়ায় তাকে চশমা বৃত্তান্তটা জানালাম। সে কোন কথা না বলে ঝুড়ির মুখে বাঁধা কাপড়ের পুটুলিটা খুলতে লাগল। অবশেষে আমার চশমাটাই বার করে আনল। যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। খুশী হয়ে তাকে কটা টাকা দিতে চাইলাম। কিন্তু সে করজোড়ে অসম্মতি জানাল।

জয় বাবা মুক্তিনাথ। শ্রীমান ধ্বনি তোলে। কৈলাসের দলও একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে।

এতক্ষণে দলের সবাই নিশ্চিন্ত। কেন না আমিই দলনেতা। আমার বিপদ মানে দলের বিপদ, আমার পরিত্রাণ মানে সকলের পরিত্রাণ।

কৈলাস ভাবতেই পারেনি ওটা আমার চশমা। কারণ যেখানে বসেছিলাম চশমাটা ঠিক সেখানে ছিল না। ৮।১০ ফুট দূরে একটা পাথরের চাতালের উপর পড়ে ছিল। সে ভেবেছে হয়ত আগের কোন যাত্রী ভুলে ফেলে গেছে। এবার আমার বেশ মনে পড়েছে—। বসবার আগে দাঁড়িয়ে চশমাটা খুলে ওখানে রেখে রুমাল দিয়ে চোখ মুখ হাত মুছেছিলুম।

দূরে বিক্রম সিংকে দেখা যাচ্ছে। গতি যাত্রাকালের তুলনায় মন্থর। ব্যবধান কমতেই দেখলাম কিছুক্ষণ আগের আমার হতাশা এখন তার চোখে মুখে। কার্যোদ্ধার করতে পারেনি। হতাশ তো হবেই।

দূর থেকে আমার চোখে চশমা দেখে সে ভূত দেখার মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের পলক পড়ছে না। কাছে আসতেই বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ বললে—মুক্তিনাথ দিলা দিয়া—। এবার কৈলাস নিজেদের ভাষায় বিক্রমকে ব্যাপারটা জানাল।

চশমা প্রাপ্তির আনন্দ বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারলাম না। শের-বাহাদুর খবর নিয়ে এল ভাল আস্তানা মিলবে না। বিমল কা হোটেল বিলকুল ফুল। উত্তরে বললাম—অমল অউর কমল?

সঙ্গীরা হেসে উঠলেও শের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলল। াতরকে ধুঙ্গা জায়গাটা খুব ছোট। মাত্র ৮৷১০ ঘর বসতি। এর মধ্যে বিমল বাহাদুরের ঘরগুলি বেশ বড় এবং পরিষ্কার। তাতে খাট বিছানা টেবিল চেয়ার এবং অন্যসব উপযোগী আসবাবপত্র। বারান্দায় মেনু চার্টও টাঙ্গানো আছে। তাতে যা লেখা আছে সব যদি পাওয়া যায় তবে বলতে হবে বিমল সত্যিই বাহাদুর।

জর্জ আর ডরোথি দেখলাম বিমলের হেপাজতে। নিশ্চয় আমাদের আগে এসে পৌঁছেছে। তবে বিক্রমের কথা শুনে মনে হ'ল; আমাদের পরে এলেও হয়ত তারা ওখানে জায়গা পেত। সাহেব খদ্দেরের প্রতি নাকি বিমলের একটা বিশেষ টান। তাই দু'একখানা সিট খালি থাকলেও সে ধৈর্যধরে শ্বেত চর্মের অপেক্ষায় থাকবে, তবুও কালো কিম্বা তামাটেকে বরণ করে নেবে না।

যাই হোক আমরাও কেষ্টর জীব। আমাদেরও গতি একটা নিশ্চয় হবে। হোলোও তাই।

শের বাহাদুর এসে তাড়া লাগায়। মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে বললে—হামারা পিছু আইয়ে।

আমরা শের বাহাদুরের পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি। কয়েকটা ধাপ নেমেই শের বাহাদুর একটা নিচু দরজার সামনে মালপত্র নামিয়ে রাখল। আমরাও তৎক্ষণে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি।

দরজার সামনে প্রশস্ত খোলা বারান্দা। বেশ পরিষ্কার। মাটি দিয়ে নিকোনো। এক প্রৌঢ়া এসে বারান্দায় একটা হাতে বোনা কম্বল পেতে দিল। জুতো খুলে বেশ আরাম করে বসলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা। মনে মনে সাহেব প্রেমী বিমলের উপর যেন প্রতিশোধ নেবার আনন্দ অনুভব করলাম।

আমাদের আস্তানার মালিক বিষ্ণুপ্রসাদ। এখন সে ঘরে নেই। কোন এক যাত্রীর সঙ্গে নাকি শিকারে গেছে। ফিরতে রাত হবে।

সন্ধ্যা হতেই বেশ শীতের আমেজ। তিরকেধুঙ্গার উচ্চতা বেশী নয়। শীতের কারণটা একটু পরেই বুঝতে পারলাম। বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়ীর ঠিক পিছনেই রয়েছে একটা ঝরণা। উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে রাস্তার উপর দিয়ে নিচে গভীর খাদে গিয়ে পড়েছে।

প্রৌঢ়া মহিলাটি বিষ্ণুপ্রসাদের স্ত্রী। এখানেও সেই একই করমুলা। ঘরের কর্ত্রীই সব। একাধারে সংসার, সময়ে যাত্রী-সমাগমে তাদের পরিচর্যা, তার উপর ছোটখাটো আরেকটা ব্যবসাও সে চালায়। দিশী পানীয় বিক্রী। ছেলে বুড়ো মহিলা বেশ কয়েকজনকে দেখলাম—এক মোহর অর্থাৎ আট আনায় ছোট এক গ্লাস হিসেবে খেয়ে যেতে। ওতে ওদের কারো কোন ঢাক ঢাক গুর গুর নেই। জিনিসটার নাম ছাং।

ঘরের মধ্যে ছোট ৩ খানা তক্তপোশ। আমরা পুরুষ ৩ জনে দখল করে নিলাম। মা মেয়ের বিছানা নিচেই পাতা হ'ল। অবশ্য মেঝের জন্য ডবল কম্বল বরাদ্দ।

সকলের বিছানার উপর জাঁকিয়ে বসে কর্ত্রীদিদিকে চায়ের ফরমাস করলাম। আর ছেলেকে বললাম—ঝুড়ি থেকে সকালের সংগ্রহ সেই ডুনট্ রুটি বার করতে।

ঘরের মাঝখানে উনুন পাতা। কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। তবে এই ঠাণ্ডায় আগুনের উষ্ণতা ও কাম্য। তাই বাধ্য হয়ে ধোঁয়া সহ্য করা ভিন্ন উপায় কি। তবু ও বিষ্ণুপ্রিয়া কে

(বিষ্ণুপ্রসাদের স্ত্রী, তাই এই সম্বোধন) অনুরোধ জানালাম যাতে ধোঁয়া কম আগুন বেশী হয়।

চা-পর্ব শেষ হতেই বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে জানতে চাইলাম রাত্রে, কি ব্যবস্থা হবে। উত্তরে সে বললে যা অভিরুচি। অর্থাৎ মাংস ডিম ডাল সব্জী ইত্যাদি। মাংসের নাম শুনে ছেলে তো মহাখুশী। তাড়াতাড়ি জানতে চাইল মাটন্ না চিকেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কোন কথা বলল না, কেবল চোখ দুটো উপরের দিকে তুলে ধরল। দেখাদেখি আমরাও তাকালাম। কি ওসব? সকলে একবাক্যে বলে উঠলাম।

আমাদের আশ্চর্য হতে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া বিক্রমের দিকে তাকায়, বলতে চায় যা বোঝাবার তুমিই বোঝাও। বিক্রমের কথায় সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাংস খাবার ইচ্ছাও বিদায় নিল।

উনুনের উপরে বাঁশের গায়ে লোহার শিক আংটা করে ঝোলানো। সেই শিকে গাঁথা রয়েছে বড় বড় মাংসের টুকরো। শুকিয়ে প্রায় শুট্‌কী মাছের আকার নিয়েছে। এসব মাংস সাধারণতঃ মোষের হয়। এগুলোকে বলে ওরা 'শিকার'। অর্থাৎ বলি দেওয়া মোষের মাংস। যাত্রীদের হুকুম হলে এসব শিকে গাঁথা মাংস প্রথমে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে পরে পরম উপাদেয় করে রান্না করে পরিবেশন করা হয়। বর্ণনা শুনতেও গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল।

যাইহোক ঠিক হল রাত্রের মেনু ভাত রুটি, ডাল, সব্জী, ডিম সেদ্ধ। বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনুরোধ করলাম তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে। আজ একটু সকাল সকাল ঘুমোনো দরকার। শরীর বেশ ক্লান্ত। তা ছাড়া কাল শুরুতেই অগ্নিপরীক্ষা। বিশ্ববিখ্যাত উলেরি চড়াই।

যাক কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। আজ ঘুমটা নষ্ট করি কেন!

খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ করে লেপের ভিতর ঢুকে পড়লাম।

ঠিক সে সময় বিষ্ণুপ্রসাদ ঘরে ঢুকল। রীতিমত শিকারীর পোষাক পরনে। জনৈক বিদেশীর সঙ্গে নাকি জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিল। খালি হাতেই ফিরল দেখলাম। তবে কি শিকার তেমন জোটেনি। যাই হোক বিষ্ণুপ্রসাদ কিন্তু ওস্তাদ শিকারী। অতীতের জবরদস্ত সৈনিক, তার কাছে সামান্য পশু শিকার তুচ্ছ ব্যাপার। বিষ্ণুপ্রসাদের জবানীতে কথাগুলো জানতে পারলাম।

॥ পনের ॥

ভোর হতেই আবার সাজ সাজ রব। বিষ্ণুপ্রিয়া চা রুটি তৈরী করে দিল। আমাদের সুজি চিনি দিয়ে হালুয়া ও তৈরী হল। আজ একটু ভারী টিফিন পেটে পড়া দরকার।

বিষ্ণুপ্রসাদের ঘরের দাওয়া থেকে তীব্র উলেরি চড়াইয়ের পথরেখা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

দেখা না গেলেই বোধহয় ছিল ভাল। দুর্ভাবনাটা কম হতো। নিজের কোঁড়াকাটা নিজে দেখলে যেমন হয়।

দলে দলে যাত্রীরা বেরিয়ে পড়েছে। রোদ বাড়ার আগে যতখানি সম্ভব এগিয়ে যাওয়া যায়। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। খানিক দূরে একটা পুল পেরিয়ে চড়াইপথ ধরলাম।

প্রথমে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। তারপর অসম পাথরের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা। যেন দুর্গম কোন গিরিশৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা চলছে!

বুক ফাটা এ চড়াই নিজেই নিজের তুলনা। অমরনাথের পিস্সু কিম্বা মহাগুনাস এর কাছে কিছু নয়। তাছাড়া মদ্‌মহেশ্বর কিম্বা মণিমহেশের পথে টানা দীর্ঘ চড়াই রয়েছে। তবে কোথাও স্বল্পদূরত্বে এ হেন তীব্র চড়াই নেই। অথচ আশ্চর্য এই চড়াই পথে স্থানীয় লোকেরা অনায়াসে লাফিয়ে লাফিয়ে যাতায়াত করছে। তা ছাড়া আরো আশ্চর্য লাগে যখন সারি সারি ঘোড়া পিঠে বোঝা নিয়ে টুং টাং আওয়াজ করতে করতে অনায়াসে চলে। আমরা তাদের দেখে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়াই। কারো জন্য ওদের কোন মাথাব্যথা নেই। বিশেষতঃ মানুষের জন্য কারণ মানুষই তো নিজের স্বার্থে তাদের ভারবাহী করেছে। পশু হলেও এই অনুভূতিটি বোধহয় তাদের জাগ্রত।

যাইহোক দলের সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি টুং টাং আওয়াজ শুনলেই যেন সজাগ থাকে।

কোন দিকে না তাকিয়ে একটানা উঠে চলেছি। মাঝে মধ্যে দু এক ঢোঁক জল খেয়ে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিচ্ছি। কারো মুখে কথা নেই। চড়াই পথে কথা বলা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি দম ফুরিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ চলার পর পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে পড়ি। হাঁপধরে গেছে। ক্লান্তি তে শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে।

একটু বিশ্রাম নিতেই আবার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে উঠল। উঠে আসা পথের দিকে তাকাই। দেখে মনে হচ্ছে একগাছা মোটাদড়ি কেউ যেন উপর থেকে ফেলে দিয়েছে, আর সেটা এলো মেলো ভাবে পাহাড়ের গা জড়িয়ে নেমেছে। আর দূরে ঐ নিচে পাহাড়টার গায়ে তিরকেধুঙ্গা গ্রাম। দেশলাইয়ের খোলের মত কয়েকটা ঘরবাড়ী। পোকামাকড়ের মত লোকজন কিলবিল করছে।

এইভেবে মনে মনে আশ্বস্ত হলাম তীব্র চড়াই পথের অনেকখানি শেষ করেছি। এভাবে বাকীটুকুও শেষ করতে হবে। অতএব আর অপেক্ষা নয়। চল এগিয়ে চল।

বারে বারে কত আর জলখাব। যদি একটা কাঁকড়ি অর্থাৎ শশা কিম্বা বেলোতি অর্থাৎ পেয়ারা পেতাম তা হলে খেতে খেতে চলতে পারতাম। এপথে ও জিনিস প্রায়ই পাওয়া যায়। বসতি থাক আর নাই থাক। জঙ্গলের এখানে সেখানে বিনা পরিচর্যায় ফলন দেখেছি।

বিক্রম আশা দিয়ে বলে সামান্য একটু এগোলেই পথের ধারে দুঘর বসতি মিলবে। তাদের কাছে মিললেও মিলতে পারে।

কথা শুনে আপনা থেকেই গতি বেড়ে গেল। চলতে চলতে একসময় সেই ঘরের সামনে হাজির হলাম। কিন্তু লোকজনতো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না? তবে ঘরের দরজা হাটকরে খোলা।

বিক্রমের চিৎকারে পিছনের দরজা দিয়ে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। তাকে বলতেই ঘর থেকে একটা বুড়ো শশা নিয়ে এল। যাক গে, ওই ভেঙ্গে খাওয়া যাবে। আসল প্রয়োজন তো গলা ভেজানো! দুই মোহর দাম দিয়ে একটু নুন ফাউ চেয়ে নিলাম। এই তুচ্ছ জিনিসটার কদর হিমালয়ে অনেক। চালডালের সঙ্গে সমানগুরুত্ব দিয়ে তারা আরো দুটি জিনিস সংগ্রহ করে রাখে। একটা হ'ল কেরোসিন অন্যটা নুন! তাই কোন সময় একটু বাড়তি নুন চাইতে অস্বস্তি লাগে।

কয়েক মুহূর্তের বিশ্রাম। আবার চলা সুরু। বিক্রম অভয় দিয়ে বলল পথ আর বেশী নেই, বড় জোর পনের মিনিট লাগবে। ভরসা পেয়ে সাহস ও শক্তি দুই যেন বেড়ে গেল। দ্রুতলয়ে এঁকে বেঁকে ধাপে ধাপে উঠে চলি।

অবশেষে এক সময় গ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেলাম। গ্রামের কেন্দ্রস্থল যদিও কিছুটা দূরে তবুও চড়াই পথের এখানেই শেষ দেখে মন আনন্দে ভরে গেল।

গ্রামের মধ্য দিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে একটা বাড়ীর খোলা বারান্দার উপর পাতা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে লেবুর সরবত নিয়ে শের বাহাদুর হাজির। কি ব্যাপার? না, এটা শের বাহাদুর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই করেছে। এ পথ উত্তরণের পর প্রথমেই দরকার ঠাণ্ডা পানীয়। তাই সে আগে এসে ব্যবস্থা করে রেখেছে। দাম দিতে হলেও সময়োপযোগী ব্যবস্থা করার জন্য তাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমাদের আগে বেশ কয়েকজন বিদেশী যাত্রী এসে পৌঁছেছে। তাদের সকলেই চা কিম্বা কফি পানে রত। দিগন্তে চোখরেখে চুপচাপ বসে।

সত্যি বলতে কি এখান থেকে মচ্ছপুছারে শৃঙ্গটির দিকে তাকালে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। উলেরির মত আর কোন জায়গা থেকে পুচ্ছটিকে

এত পরিষ্কার এবং সুন্দর দেখায় না।

উলেরিগ্রামে একটা অসুবিধা চরম। সেটা হচ্ছে জলাভাব। পর্বতশীর্ষে প্রশস্ত উপত্যকায় এ গ্রামের অবস্থান। তাই নলের সাহায্যে বহুদুরে উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরণার ধারা থেকে জল নিয়ে আসতে হয় এ গ্রামে।

গ্রামের মধ্যদিয়ে চলতে গিয়ে মনে হয়েছে গ্রামটা পরিষ্কার ছিমছাম। গ্রামের বাসিন্দারা, বিশেষ করে মেয়েরা সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা। আমরা এসেছি পুজোর মাসে। ঘরে ঘরে তাই সাজ সজ্জার উদ্যোগ আয়োজন। আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করলাম। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে পেছনে, আনাচে কানাচে ফুলগাছ। শবজী গাছ ও আছে, তবে ফুলেরই আধিক্য।

শের বাহাদুরকে ডেকে বললাম—আচ্ছা, দুপুরের খাওয়াটা এখানে সেরে ফেললেই তো হয়। শের বাহাদুর তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—হ্যাঁ তাই হবে, তবে আরো খানিকটা এগিয়ে। আমি এগিয়ে যাচ্ছি আপনারা ধীরে সুস্থে আসুন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এদের কয়েকটা নির্দিষ্ট ঘাঁটি আছে। সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও এরা উঠতে চায়না। তার কারণ প্রথমতঃ আত্মীয়তা বা পরিচিতি নয়ত কিছু আর্থিক সাশ্রয়।

যাই হোক শের বাহাদুরের উপদেশ মত এগিয়ে চললাম। গ্রামের মধ্যদিয়ে পথ। চড়াই উৎরাই বিশেষ নেই। তবে প্রখর সূর্য তেজে পথ চলা দায়।

খানিকদূর এগোতেই গ্রামের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গেলাম। এখানেই একটা বাড়ীতে শের বাহাদুর খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। রাস্তার ধারে একখানা মাত্র ঘর। তার মধ্যেই সব। নিজেদের থাকা খাওয়া এবং প্রয়োজনে একাংশে ট্যুরিষ্ট লজ।

ঘরে ঢুকেই দেখি একপাশে কম্বল পাতা। জুতো মোজা খুলে তার উপর বসে পড়লাম। রান্না শেষ হতে আরো ঘণ্টা খানেক লাগবে মনে হয়। অতএব একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক।

যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার যাত্রাসুরু। এও চড়াই পথ। তবে তেমন তীব্র নয়। মনে হচ্ছে যা পেরিয়ে এসেছি তার সামান্য জের এখনো চলছে।

খানিকদূর এগোতেই অরণ্যপথের সীমানায় এসে পৌঁছলাম। যাক, বাঁচা গেল। চড়াই পথ যদি ছায়া ঘেরা হয় কষ্টটা তুলনায় কম।

ঘন বনভূমির মধ্যদিয়ে আঁকাবাঁকা ঢেউখেলানো পথে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট গাছ বনের ঘনত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। সূর্যের আলো প্রবেশ করার উপায় নেই। তাই দিনের বেলায়ও আবছা অন্ধকার।

পথের মাঝে কোথাও কোথাও বিরাট ভাঙ্গন। কাদামাটি, সঙ্গে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছোটবড় পাথরের টুকরো। নিশ্চন্তে পা ফেলার যো নেই। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাবার ভয়।

পথের এ হাল হবার কারণ রৌদ্রের অভাব। বর্ষা কিম্বা ঝরণার জল কিছুতেই শুকোতে পারে না। তার উপর গাছের পাতা পড়ে পচে গিয়ে কাদার স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তোলে। বাকী কাজটা সমাধা হয় মানুষ আর অশ্ব ক্ষুরের পেষণে। দু'এক জায়গায় জুতো খুলে কাদার মণ্ড মাড়িয়ে যেতে হ'ল।

এ সব পথে আরেকটা ভয় জোঁকের। কাদায় পাথরে ঘাসের মধ্যে কিম্বা গাছের পাতায় প্রায় সর্বত্র জোঁক কিলবিল করে। বর্ষায় অর্থাৎ জলকাদায় উৎপাত বাড়ে। তাই এসব বনপথে সাবধানে চলতে হয়। নজর রাখতে হয় যাতে না জোঁক ধরে নেয়। জোঁকে ধরলে প্রথমে টের পাওয়া যায় না। তারপর আস্তে আস্তে সুবিধামত এক জায়গায় কামড়ে ধরে রক্ত চোষে। তখনি সে জায়গায় চিন চিন্ করতে সুরু করে। জোঁকে ধরলে অনেকেই দেখেছি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফাতে থাকেন। একটু সাহস করে হাত দিয়ে জোঁক টাকে গা থেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেন না। এত ভয়। যাই হোক অরণ্যপথে সাবধানে পথ চলি। তবে এপথে আনন্দের উপাদান ও যথেষ্ট

রয়েছে। ছায়াঘেরা গভীর বনপথ। স্তব্ধ, নিঃসীম। বাতাসে দোলায়িত বৃক্ষলতা। সিরসির পাতার শব্দ। গভীর অরণ্যানীর বুক চিরে ধ্বনিত হয় পাখীর কূজন। গাছপালার ফাঁকে একফালি রুপোলী আলো। গাছের গা জড়িয়ে হাজারো লতার আলিঙ্গন। সর্বাঙ্গে বিচিত্র ফুলের বাহার। সুমধুর গন্ধে মুখরিত বনতল। কোথাও বা পাহাড়ের গায়ে পাথুরে ফাটল বেয়ে নেমে এসেছে স্বচ্ছ জল ধারা। সুপেয়, ক্লান্তি হরা। সব মিলিয়ে এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় পরিবেশ। কষ্টের মধ্যে কেষ্ট।

আজকের পরিক্রমা সত্যিই কষ্টকর। সকলের চলন দেখে বেশ বুঝতে পারছি পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। শের বাহাদুর আর বিক্রম পদে পদে উৎসাহ জোগায়। আর মাত্র সামান্য পথ এগোলেই ঘোরেপানি। সেখানে না হয় আজকের মত বিশ্রাম নেওয়া যাবে! বিশ্রামের কথা শুনে শেষ শক্তিটুকুও উজাড় করে দিই। আর মাত্র একটা ধাক্কা, তাহলেই ঘোরেপানি।

সব জায়গায় দেখেছি—শেষের পথটুকু যেন আর ফুরোত চায় না। সামান্য চড়াই পথ ও তীব্র মনে হয়। গতি হয় মন্থর।

ধীরে ধীরে এক পা দু'পা করে চড়াই পথে এগিয়ে যাই। সকাল থেকে একটানা চড়াই চলছে। তিরকেধুঙ্গা থেকে ঘোরেপানির উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট বেশী।

চলতে চলতে পথের বাঁকে হঠাৎ ঘোরেপানির দর্শন মিলল। গভীর বনমধ্যে একখণ্ড সবুজ উপত্যকা। বেশ কয়েকটা ঘর বাড়ী। বেশীর ভাগ পাথরের দেওয়াল, টালির ছাউনি। গভীর অরণ্যের মধ্যে যেন এক ফালি সুন্দর বাগান। পথশ্রমে ক্লান্ত যাত্রীদের যথার্থ বিনোদন কেন্দ্র। আশ্রয়স্থল তো বটেই।

বনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গেলাম। দীর্ঘ চড়াই পথের সমাপ্তি। এবার সামান্য উৎরাই পথে ঘোরেপানি উপত্যকায় নেমে চলেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশ্রামের সুযোগ মিলবে। এই অনুভূতিতে দেহভার ও হাল্কা মনে হয়।

॥ ষোল ॥

ঘোরেপানি। মুক্তিনাথের পথে সর্বোচ্চ উপত্যকা। মাত্র কয়েকঘর বাসিন্দা। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে ফল ও ফুলের বাগান। উপত্যকায় ঢালু অংশে শস্য ক্ষেত। উপত্যকাটি আকারে ছোট হলেও শস্য সবুজ। যাত্রীদের থাকবার ও বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে। যাত্রী নিবাসে কিম্বা স্থানীয় লোকের ঘরে অনায়াসে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে।

গভীর অরণ্যানীর মধ্যে ঘোরেপানির অবস্থিতি সত্যই অপূর্ব। গাঢ় শ্যামল বনভূমির কেন্দ্র বিন্দুতে যেন এক অপরূপ রঙীন ছবি। ছবিটি আবার নীলগিরি এবং ধৌলাগিরি ফ্রেমে আবদ্ধ।

সব মিলিয়ে ঘোরেপানির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরিসীম। দিগন্তে শ্যামল বনানীর মাথার উপর এই দুই ধ্যানমগ্ন ঋষির উড্ডীন শুভ্র জটাজাল। ইচ্ছে হয় যুগ যুগ ধরে তন্ময় হয়ে শুধু চেয়ে থাকি। সৃষ্টির এই রূপময় বৈচিত্র্যের প্রতিফলন হিমগিরির সর্বাঙ্গে। যুগযুগান্ত ধরে তারই আকর্ষণে ছুটে আসে রূপমুগ্ধ যাত্রীপ্রবাহ। অন্তহীন, বিরাম-বিহীন। তাই এই মুহূর্তে আমিও প্রণাম জানাই এই রূপময় দেবতাত্মা হিমালয়কে। তিনি যে শান্তির আধার, করুণাময়। তাঁরই আশীর্বাণী নিয়ে নেমে এসেছে অপার স্নিগ্ধ করুণাধারা। গঙ্গা যমুনা মন্দাকিনী অলকানন্দা। শত তরঙ্গ ভঙ্গে নৃত্যচপল ছন্দে বয়ে চলে সমতলে। জীবের কল্যাণে। গড়ে তোলে সবুজের সমারোহের। জীবের জীবন।

সামান্য বিশ্রামের পর ঘোরেপানি ছেড়ে চলি। শের বাহাদুর এখানে থাকতে নারাজ। একে জায়গার তুলনায় যাত্রী সমাগম হয়েছে বেশী। তাও আবার বেশীর ভাগ বিদেশী পর্যটক। থাকা খাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা হবে। তাছাড়া উচ্চতাহেতু ঠাণ্ডা ও বেশী। দরকার কি! আরেকটু এগিয়ে গেলেই নিরিবিলিতে ভাল আস্তানা পাওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আরেকটু আগে মানে তো সেই শিখা। সেতো এখনো অনেক দূর। পৌঁছোতে তো সন্ধ্যা উত্‌রে যাবে। শের বাহাদুর অভয় দিয়ে বলল—শিখা কেন? তার আগেই ব্যবস্থা করব। এবং বেশ ভাল ব্যবস্থা। এখন পা চালিয়ে আসুন।

বেশ তাই চল। পথের অভিভাবক তুমি। অতএব তোমার উপর নির্ভয়ে নির্ভর করে থাকাই কর্তব্য। অচেনা অজানা পথে অভিজ্ঞ গাইডের উপর আমি একান্তভাবে নির্ভরশীল। যাকে বলে অন্ধ আত্ম-সমর্পণ। এধরণের প্রসঙ্গে আমার বন্ধুর একটা ব্যাখ্যা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। ব্যাখাটা মহাভারতের দৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে।

কুরু সভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে উদ্যত। দ্রৌপদী প্রাণপণে বাধা দিয়ে চলেছেন। বিপুল শক্তিধর দ্বিতীয় কৌরবের সঙ্গে অবলা দ্রৌপদীপারবেন কেন! দুঃশাসন সজোরে টেনে হিঁচড়ে কাপড় খুলে ফেলছে। লজ্জা ভয়ে আতঙ্কিত দ্রৌপদী একহাতে প্রাণপণে দুঃশাসনকে বাধা দিচ্ছেন, অন্যহাতে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে কাতর আহ্বান জানাচ্ছেন। মধুসূদন কিন্তু নিবিকার। অন্তরীক্ষ্যে বসে প্রিয়সখীর লাঞ্ছনা দেখেও মিটিমিটি হাসছেন। দ্রৌপদী দেখলেন আর উপায় নেই। কাপড়ের শেষ প্রান্তটুকু শুধু বাকী। অমনি দুহাত তুলে কেঁদে কেঁদে বললেন—নারায়ণ—হে মধুসূদন, রক্ষা কর—রক্ষা কর পাঞ্চালীরে—। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের আশীর্বাদ নেমে এল কাপড়ের আকারে। পরতে পরতে জড়িয়ে যাচ্ছে দৌপদীর অঙ্গে। দুঃশাসন খুলছে তো খুলছেই। শেষ আর হয় না। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দুঃশাসন বিরত হয়। দ্রৌপদীও চরম লজ্জার হাত থেকে রেহাই পান।

এই কাহিনী থেকে বন্ধুবর একটা উপলব্ধি আহরণ করেছেন—। প্রথমে দ্রৌপদী দুই নৌকোয় পা রেখেছেন। একহাতে দুঃশাসনকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, অন্যহাতে নারায়ণের করুণা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু নারায়ণ একমাত্র তখনই ভক্তের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন—

যখন দেখলেন ভক্ত একান্ত ভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল।

তাই কথা হচ্ছে যে কোন .কাজে যেই হোক, যার উপরই হোক, নির্ভর যদি করতেই হয় তবে দ্বিধাহীন চিত্তে একান্তভাবে করাই বাঞ্ছনীয়। তাই এক্ষেত্রে শের বাহাদুরের কথায় দ্বিরুক্তি না করে এগিয়ে চললাম।

ঘোরেপানি বসতি অঞ্চল ছেড়ে চড়াই পথে এগিয়ে চলি। খানিক দূর উঠলেই উঁচু গিরিশিরার সমাপ্তি। তখন আবার গভীর জঙ্গলের সুরু। অর্থাৎ ঘোরেপানি উপত্যকাটা আকারে ডিসের মত।

চারদিকটা কিছুটা উঁচু। এই উঁচু প্রান্ত থেকেই গভীর জঙ্গল চারিদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে।

আমরাও এবার গভীর বনের মধ্য দিয়ে উৎরাই পথে নেমে চলি। পথ বলে কিছু নেই। শুধু একটা পায়ে চলা দাগ এঁকে বেঁকে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে নেমে গেছে। জঙ্গল কোথাও ঘন কোথাও বা হাল্কা। বন যেখানে ঘন সেখানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে জানা অজানা বহু বড় বড় গাছ। তার মধ্যে পাইন ফার দেওদার ইত্যাদিই বেশী। তাছাড়া জায়গায় জায়গায় জঙ্গল বেশ হাল্কা। সেখানে শুধু ছোট ছোট ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম। গায়ে ঝুলছে রঙবেরঙের অসংখ্য ফুল।

গাঢ় সবুজ বনের মধ্য দিয়ে সরু মেঠো পথে এগিয়ে চলেছি। চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ। এই গম্ভীর উদাস নির্জনতা মনে আনে প্রশান্তি। এই শ্যামল স্তব্ধতার মধ্যে চিন্তার খরগতি শান্তির মূর্চ্ছনায় সমাহিত। মুহূর্তের জন্য হলেও যেন স্বর্গীয় অনুভূতির শিহরণ।

পাখীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে। কানে আসে শুকনো পাতার খস খস শব্দ। গরু মোষ দু'একটা জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয় লোকালয়ের কাছে এসে গেছি। গভীর বনভূমির ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ ছেড়ে এবার লোকালয়ে প্রবেশ করব। যেখানে রয়েছে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের উপকরণ। তাই বাঁচার তাগিদে লোকালয় আমাদের প্রিয়। দায়-দায়িত্ব-কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ আমরা।

জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজনে আমরা লোকালয়ে থাকতেই অভ্যস্ত। কিন্তু জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষ যখন শ্যামল বনানীর শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রমিক পরিবেশের সান্নিধ্যে কখনো আসে, তখন সে অপার শান্তির মূর্চ্ছনায় তন্ময় হয়ে ওঠে। মুহূর্তের জন্য হলেও কল্পনার স্বর্গ রাজ্যে অমৃতের স্পর্শে ধন্য হয়।

উৎরাই- পথ বনপথ একসঙ্গেই শেষ হ'ল। সমতলে নেমে পেলাম লোকালয়। পিছনে পড়ে রইল পর্দায় অঙ্কিত পার্বত্য বনভূমির চিত্রপট। আমরা হিমালয়ের এক দুর্গম তীর্থপথের যাত্রী। এই প্রেক্ষাপট নাট্যমঞ্চের অনুকরণে আমাদের গতিপথে প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতীক। ধন্য আমরা, ভাগ্যবান আমরা। এই অমৃতময় তীর্থপথে প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যের সুষমায় আমরা সঞ্জীবিত।

লোকালয়ে প্রবেশ করতেই দৃশ্যান্তর ঘটল। ঢেউ খেলানো প্রশস্ত উপত্যকা। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সাজানো ঘর বাড়ী। কোথাও সারি সারি জমাট। আবার কোথাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বাকী অংশে সবুজ গালিচা পাতা। ফলে ফুলে ফসলে ভরপুর। নিচে বয়ে চলেছে ঘোরেখোলা নদী। পার্শ্ববর্তী সুউচ্চ গিরিশিরা থেকে নেমে এসেছে উপত্যকার বুক চিরে। উচ্ছল অরণ্যপ্রবাহের মত নেচে নেচে, এঁকেবেঁকে।

ধেউলিগ্রাম ছাড়িয়ে চিত্রে গ্রামে এসে পড়লাম। আমি আর বিক্রম সবার পিছনে। বাকী সবাই এগিয়ে গেছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জানি না আজকের ডেরা কোথায় পাতা হবে। সব ভার 'নর-নারায়ণ' শেরবাহাদুর নিয়েছে। অতএব আমার চিন্তা করা বৃথা। তবে দিনের শেষে ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চাইছে। টলতে টলতে কোন রকমে এগিয়ে চলেছি। ধীরে চলার জন্য বিক্রম অনুযোগ করে তাড়া দেয়। আমার দেহের খোলসটা দেখে তার ধারণা যৌবনকে আমি এখনো ধরে রাখতে পেরেছি। তাই ধীরে-চলা-নীতি আমার পক্ষে বেমানান।

মনে মনে হাসি আর বলি—হায় রে! কি করে বোঝাবো তোমাকে বিক্রম সিং—যৌবনের বাহ্যিক আবরণ এখনো কিছুটা বজায় থাকলেও ভেতরের সামর্থটাকে যে দুর্গম হিমগিরি কন্দরে হারিয়ে বসে আছি। অন্যের তুলনায় আমি হয়ত হেরে গেছি। নয়ত পঞ্চাশোর্ধে অনেকেই হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য দিনান্তে তাদের ক্লান্তির পরিমাপটা আমার জানা নেই।

যাই হোক বিক্রমের প্রেরণায় শক্তির সলতেটা উসকে দি। গতি বাড়ে। ক্লান্তি ভুলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলি। কিন্তু কতক্ষণ? শেরবাহাদুর একবার বলেছিল আজকের বিশ্রাম হবে শিখাতে। কিন্তু সেতো অনেক দূর। সবে চিত্রে সুরু। এদিকে শরীরের যা অবস্থা—।

কিছুদূর এগোতেই সমস্ত ভাবনা চিন্তার অবসান ঘটল। এবার আনন্দে আত্মহারা হবার পালা। পথের বাঁক ঘুরতেই দলের সবাইকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে শের বাহাদুর হাসিমুখে এগিয়ে এল। বললে—একমাত্র আমার কথা ভেবেই সে এখানে ডেরা পেতেছে। মনে মনে ভাবলাম শেরবাহাদুর অন্তর্যামী।

॥ সতের ॥

"পাহাড়ী হোটেল।" চিত্রে গ্রামে একমাত্র যাত্রী নিবাস। নতুন বাড়ী, দোতলা। নিচের তলায় নিজেদের বাসস্থান এবং রান্না ঘর। দোতলা সম্পূর্ণ ছাত্রীদের জন্য ৮।১০টা বেড পাতা। সুসজ্জিত ছিমছাম। মালিকের নাম ইয়াম বাহাদুর। দুই ছেলে হোটেলটি দেখাশুনা করে। যাত্রীরা সাধারণত এখানে থামে না। হয় আগে ঘোরেপানি, নয় পরে শিখা। অবশ্য আমাদের মত অবস্থায় পড়লে স্বতন্ত্র কথা। তবে এখানকার পরিবেশটা বেশ চমৎকার। রাস্তার ধারে হোটেলটি। সামনে একটা শানবাঁধানো চৌকো বেদী। তার উপর একটা টেবিল ও ৫.৬ খানা চেয়ার পাতা।

নীল আকাশের নিচে ঐ বেদীর উপর আমরা গোল হয়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চা পরোটা এসে গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর চেয়ার এলিয়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। আঃ কি আরাম।

চিত্রে গ্রামটা শান্ত নির্জন। ঘর বাড়ী খুব কম। অন্ততঃ রাস্তার দু'পাশে তো বটেই। তাই রাস্তা সংলগ্ন এই আস্তানাটি অনায়াসে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেওয়ালে সাইনবোর্ড আঁটা—PAHARI HOTEL

রাত্রে আহারের ব্যবস্থাও মন্দ হ'ল না। ডাল সবজী আর ডিমের কারি। সঙ্গে ভাত কিম্বা রুটি। শোওয়ার ব্যবস্থাও ভাল। তক্তপোষের উপর তোষক পাতা, কাচা চাদর, সঙ্গে পরিষ্কার লেপ ও বালিশ। হোটেলটি সবে খোলা হয়েছে। তাই সবকিছু এখনো নতুন রয়েছে। তবে হিমালয়ের সেই চিরন্তন সমস্যা এখানে ও বর্তমান। শৌচাগারের অভাব। এরা সব কিছুতেই সৌখীন, কেবল ঐ একটা ব্যাপারে ওদের চরম অবহেলা। এত সুন্দর এই হোটেলটায় কোন শৌচাগার নেই। পরে তৈরী হবে কিনা জানি না, উপস্থিত জঙ্গলই সম্বল।

রাত ৮টা নাগাদ দুজন সাহেব যাত্রী এসে হাজির। তারা নেমে

আসছে। আমাদের পাশেই তাদের বিছানা পড়ল। লণ্ডন কলকাতার ব্যবধান মানচিত্রে যাই থাক না কেন, চিত্রের পাহাড়ী দোতলায় উভয়ের ব্যবধান মাত্র একগজ।

আলো নিভিয়ে যে যার শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাসিকা গর্জন শুরু হল। অন্ধকারের মধ্যে গর্জনটা দিশী না বিলিতি বোঝা গেল না।

সকাল হোতেই আবার যাত্রা সুরু। খানিকদূর এগোতেই দেখি ধ্বসে রাস্তা প্রায় নিশ্চিহ্ন। খাদের পাশে ফুট খানেক চওড়া কাদা মাটির আল। তারই উপর দিয়ে সন্তর্পণে পথ চলা। প্রতি মূহুর্তে চরম সংশয়। মুক্তিনাথের কৃপায় সবাই ঐ বিপজ্জনক পথ টুকু পেরিয়ে এলাম।

চিত্রে থেকে শিখা পথ প্রায় সমতল। দূরত্ব বড় জোড় দুই কিম্বা আড়াই মাইল। তবুও পৌনে দুঘণ্টা সময় লাগল শিখা পৌঁছতে।

শিখা গ্রামটি বেশ বড়। ঘরবাড়ী ও তুলনায় বেশী। প্রতিটি বাড়ীর সঙ্গে কিছু না কিছু সবজী ক্ষেত। লাউ কুমড়ো শশা ধান মুখ্য। শিখার চারিদিকে ঢেউ খেলানো পাহাড়। তার গায়ে ধাপে ধাপে শস্যক্ষেত। কোথাও সবুজ কোথাও বা হলদে ছোপ।

শিখা গ্রামে যাত্রীদের থাকাখাওয়ার বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। তাই এপথে বেশীর ভাগ যাত্রীরা প্রয়োজনে এখানে রাত কাটায়।

আমরা এখানে আরেক দফা পরোটা সহযোগে চা খেয়ে নিলাম। কেননা সামনে কয়েকঘণ্টা কিছুই পাওয়া যাবে না। একরকম নিরম্বু কাটাতে হবে। তাছাড়া পথের ক্লেশও অপরিসীম। প্রথমে খানিকটা পথ চড়াই উৎরাই। পরে টানা উৎরাই। দুপুর একটার আগে তাতোপানি পৌঁছানো কিছুতেই সম্ভব হবে না।

শিখা ছেড়ে এগিয়ে চলি। প্রথমে খানিকটা পথ উতরাই। তারপর মোটামুটি সমতল। কিছুদূর এগিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম—ঘারে। মাত্র কয়েক ঘর বসতি। পাহাড়ের ঢালে ইতস্ততঃ কয়েক টুকরো

ফসলের ক্ষেত। এখানকার পাহাড়ে মাটির ভাগ কম। অধিকাংশ পাথুরে।

চলার পথও টুকরো পাথরে ভর্তি। পাহাড়ের গায়ে সরু একফালি পায়ে চলার দাগ। শেষটায় বেয়ে বেয়ে গিরি শিরার মাথায় উঠে এলাম। এবার সুরু হবে দুরন্ত উৎরাই।

টানা নেমে যেতে হবে একেবারে নদীর ধারে। কালীগণ্ডকী আর ঘারেখোলা নদীর সঙ্গম স্থলে। এ হেন টানা দীর্ঘ উৎরাই পথ ইতিমধ্যে আমরা আরো একটা অতিক্রম করে এসেছি। চন্দ্রকোট থেকে বীরেথাটি। উভয় পথের চেহারা অনেকটা একই রকম।

উৎরাই পথের সুরুতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। দ্রুত পা ফেলে এগোনো যায়। কষ্ট হয় খানিকটা চলার পর। তখন হাঁটুতে টান ধরে। মনে হয় মা ই চাকিটা এবার খসে পড়ে যাবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে সরু একফালি পথ। এঁকে বেঁকে ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে গেছে। দূর থেকে নিচের চলমান যাত্রীদের মনে হচ্ছে যেন পিঁপড়ের সারি। ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। নিচে নদীর পুলটাকে মনে হচ্ছে দেশলাইয়ের খোল দিয়ে তৈরী খেলনা পুল। সাবধানে পথ চলি। সরু চলার পথে ছোট বড় অসংখ্য পাথর। অসাবধানে চরম বিপদ ঘটতে পারে। পাশে খাদের যা গভীরতা—তাকাতে ভয় হয়।

দু'একজায়গায় প্রশস্ত ঢালু উপত্যকার উপর দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে। সেখানে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা ঘরবাড়ী। আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শস্যক্ষেত। কয়েকটা ঝরণা ধারা এই অংশের প্রাণ প্রাচুর্যের মূলে।

গাছের ছায়ায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। সহযাত্রী সবাই পিছনে রয়েছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হয়ত আমার মত তারাও ক্লান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে।

অনেকদূর নেমে এসেছি। এখনো কালীগণ্ডকী বহুদূরে। অনেক

নিচে। বসে থেকে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাতোপানি পৌঁছতেই হবে। খিদের অন্ন একমাত্র সেখানেই জুটবে শিখার সেই পরোটা শুধু মনেই আছে, পেটে নেই।

উঠে দাঁড়াই। অদূরে সঙ্গীদেরও দেখা মিলল। ইশারায় এগিয়ে আসতে বলে আমি চলতে সুরু করলাম। যত নদীর কাছাকাছি হচ্ছি, ততই আনন্দ বাড়ছে। নদী সঙ্গম থেকে তাতোপানির দূরত্ব সামান্য। পথও প্রায় সমতল। দ্রুত পৌঁছে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, সঙ্গীরা পৌঁছই যেন খেতে পায়। ছেলেমেয়ে দুটির কথা মনে হতেই আরো দ্রুত এগিয়ে চলি।

অবশেষে নদী সঙ্গমে নেমে এলাম। কালীগণ্ডকী আর ঘারেখোলা নদী এখানে এসে উভয়ে মিলিত হয়েছে।

নদী সঙ্গমে এসে নদীর উৎসস্থানের কথা মনে পড়ে গেল। এক দিকে ধৌলাগিরি অন্যদিকে অন্নপূর্ণা এই দুই গিরি শ্রেণীর মধ্যবর্তী কোন এক তুষার শৃঙ্গ থেকে নেমে এসেছে এই কালীগণ্ডকী বা কালী-গঙ্গা। মুক্তিনাথের আশীর্বাদ নিয়ে নেমে এসেছে। গহনগিরি কন্দর ভেদ করে এঁকে বেঁকে ক্রমশঃ নেমে গেছে সমতলের দিকে। নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে আছড়ে পড়েছে পতিত পাবনী মা গঙ্গার বুকে।

আমরা মুক্তিনাথ যাত্রী। মুক্তিনাথের করুণাপ্রার্থী। তাই তাঁরি কৃপাধন্য স্রোতাস্বিনী কালীগঙ্গার প্রবাহ ধরে এগিয়ে চলেছি।

নদী সঙ্গমে পৌঁছোতে দিগন্তে ভেসে উঠল হিমগিরির আরেক উজ্জ্বল রত্ন—তুষার শুভ্র নীলগিরি। অন্নপূর্ণা ধৌলাগিরি পর্বতমালার অংশবিশেষে এই নীলগিরি শৃঙ্গের অবস্থান।

নীলগিরির উচ্চতা ২৩৪৬০ ফুট। এই শৃঙ্গ বহুকাল ধরে অজেয় ছিল। অবশেষে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত ওলন্দাজ পর্বতারোহী আলবার্ট এগলর এবং বিখ্যাত ফরাসী পর্বতারোহী লায়োনেল টেরী যুগ্মভাবে এই নীলগিরি শিখরে আরোহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন

আরো কয়েকজন ওলন্দাজ পর্বতারোহী এবং শেরপা ওয়াংদি। ১৯শে অক্টোবর সকাল ৯টায় তাঁরা এই পর্বতশৃঙ্গে পদার্পণ করেন।

কালীগণ্ডকী ঘারেখোলার সঙ্গমস্থল পিছনে ফেলে এগিয়ে যাই। কিছুদূর এগোতেই তাতোপাণি গ্রামের প্রবেশমুখে এসে পড়লাম। প্রথমেই দু'চারখানা ঘরবাড়ী নজরে পড়ল। খড়ের চালের ছোট ছোট ঘর। চারিদিকে দৈন্যের ছাপ। ক্রমশঃ যত এগিয়ে চলি সচ্ছলতা এবং আভিজাত্য বেড়ে চলে। পথের দুধারে পরিষ্কার ছিমছাম ঘর বাড়ী, যাত্রী নিবাস। একদিকে নদীপ্রবাহ, অন্যদিকে পাহাড়ের ধাপে ধাপে ঘরবাড়ী, শস্যক্ষেত, ফল-ফুল-সব্জীবাগান। চারি দিকে প্রকৃতির ঐশ্বর্যময়ী রূপ।

এ পথে চলতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের একটা বিরাট বিভাজন এই তাতোপানি। এখান থেকে সুরু হয়েছে প্রকৃতির নব অঙ্গরাগ। পর্বতগাত্রে ঘন সবুজ বনের সমারোহ। নেমে এসেছে একেবারে কালীগঙ্গার ধারে। সবুজ বনানীর মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে উদ্দাম স্রোতস্বিনী। কোথাও সঙ্কীর্ণ গিরিখাদের মধ্য দিয়ে। আবার কোথাও শুভ্র প্রশস্ত বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে বহুধারায় বিভক্ত হয়ে। দিগন্তে নীল আকাশের সিংহদ্বারে যুগ যুগ ধরে অতন্দ্র প্রহরায় রত—ধৌলাগিরি অন্নপূর্ণা নীলগিরি মচ্ছপুছারে—জানা অজানা আরো কত তুষার শৃঙ্গ।

বেলা একটা নাগাদ ট্রেকার্স লজে এসে হাজির হলাম। সঙ্গে সঙ্গে দিদিকে খাবার অর্ডার দিয়ে স্নানের উদ্যোগ করতে লাগলাম। ইত্যবসরে সঙ্গীরা সকলেই এসে গেছে। সকলেই তাতো পানির সেই উষ্ণ-প্রস্রবণে স্নান করতে ইচ্ছুক। গতকাল বীরেথান্টিতে সকলে নাম মাত্র কাক স্নান করেছিলাম।

ট্রেকার্স লজ তাতোপানির সর্বশ্রেষ্ঠ লজ। রাস্তাসংলগ্ন একটা প্রশস্ত উদ্যানের মাঝখানে এই লজ। থাকার ঘর বেশী না থাকলেও এর পরিবেশ সত্যিই চমৎকার। তাছাড়া এখানে থাকার আরেকটা

সুবিধা হচ্ছে হটস্প্রীং অর্থাৎ উষ্ণ প্রস্রবণটা এই ট্রেকার্স লজের ঠিক পিছনে, নদীর ধারে।

একে একে সবাই সেই তাতপানি অর্থাৎ তাতাপানিতে স্নান সেরে এলাম। আঃ, স্নানে সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। নিমেষে দূর হ'ল পথের ক্লান্তি। ফিরে পেলাম স্বাভাবিক শক্তি ও ক্ষমতা। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম ফেরার পথে আবার এখানে স্নান করব। বলা বাহুল্য সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

লনে গেঞ্জী লুঙ্গি গামছা শুকোতে দিয়ে খেতে বসে গেলাম। পৌঁহতে দেরী হয়েছে তার উপর আমাদের হাতে সময় বেশী নেই, তাই শুধু ডাল তরকারীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। দিদি বলেছিল আধ ঘণ্টা দেরী করলেই ডিমের কারী মিলবে। দরকার নেই। তাছাড়া পয়সাও বাঁচল। এতেই দু'টাকা। একটা ডিমের কারী শুদ্ধ আট টাকা।

আকাশ হঠাৎ মেঘে ছেয়ে ফেলল। হয়ত বিকেলের দিকে বৃষ্টি হবে। শের বাহাদুর তাড়া লাগায়। বৃষ্টি আসায় আগে দানা পৌঁছতে হবে। পথ ও নেহাৎ কম নয়। ৬/৭ কিলোমিটার তো হবেই। তাছাড়া খানিকটা পথ চড়াই। খাওয়া দাওয়ার পর চড়াই পথে সময় ও লাগবে বেশী।

আর দেরী নয়। শুকোতে দেওয়া জিনিস গুলো এখনো বেশ ভিজে। ঐ অবস্থাতেই প্লাষ্টিকের মোড়কে বেঁধে নেওয়া হল।

আবার যাত্রা সুরু। এবার দানা, তাতোপানিতে বসতি নেহাৎ কম নয়। অনেক দূর পর্যন্ত গ্রামের পরিধি। তবে চওড়া খুব কম। তবে গ্রামটি দেখতে ভারী সুন্দর। চলার পথে বিশ্রাম ছাড়াও বহু বিদেশী তীর্থযাত্রী এখানকার পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেন।

নৈসর্গিক প্রভাব ছাড়াও তাতোপানির আরো দুটি আকর্ষণ রয়েছে। এক উষ্ণ প্রস্রবণ যার জন্যে নামই হয়েছে তাতপানি বা

তাতোপানি। দ্বিতীয় কালী গণ্ডকীর প্রবাহ।

পোখরা থেকে রওনা হয়ে আজ এই তাতোপানিতে এসেই আমরা মূল কালী গণ্ডকীর সাক্ষাৎ পেলাম। এখান থেকে মুক্তিনাথ পর্যন্ত কালী গণ্ডকী আমাদের বন্ধু, প্রেরণা, এবং, পথ প্রদর্শক। তাই তাতো পানিথেকেই প্রকৃতির একটা নতুন ভিন্ন রূপ আমার চোখে ধরা পড়ল। তাতোপানির আগে পর্যন্ত পথ ছিল হিমালয়ের আর দশটা পথের মত। রূপ বৈচিত্র্যে অদৃশ্য পূর্ব বা অসাধারণত্বের তেমন কোন ছাপ ছিল না। কিন্তু পাপতাপনাশিনী কালী গঙ্গার আর্বিভাবে সব কিছু যেন পাল্টে গেল। রূপ হয়ে উঠল অপরূপ। প্রকৃতির লীলা বৈচিত্রে নেমে এল অপার বিস্ময়। তাই আমার চোখে তাতোপানি বিভাজন রেখা।

॥ আঠার ॥

বেলা আড়াইটে নাগাদ তাতোপানি ছেড়ে রওনা দিলাম। আকাশে ঘন কালো মেঘ। শের বাহাদুর সকলের হাতে বর্ষাতি ধরিয়ে দিল।

গ্রাম ছাড়াতেই কালীগণ্ডকীর তীরে এসে পড়লাম। উঁচুনীচু পাথুরে ধাপ বেয়ে পথ। নদীর তীর ঘেঁষে। কোথাও বা সামান্য চড়াই উৎরাই। নদীর তীরে পথের ধারে ছোটবড় অসংখ্য গাছ। কোথাও বা ঢালু চত্বরে ফলের বাগান অথবা সবজীক্ষেত্র। ছায়াঘেরা নির্জন বনপথে একমাত্র সাথী কালীগণ্ডকী। তারি উদ্দাম কলতানে পথের ক্লান্তি ভুলে যাই। সুরমূর্চ্ছনার আনন্দে মন ভরে ওঠে!

হঠাৎ সুরু হল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রেইনকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। বিক্রমের তাড়া খেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলি। বৃষ্টি জোরে এলে আর রক্ষে নেই। এমনতেই বর্ষার কাদা এখনো শুকোয়নি তার উপর বৃষ্টি।

পথ এখনো অনেক বাকী। প্রায় অর্দ্ধেক। বৃষ্টি আরো জোরে নামল। সঙ্গে মেঘ গর্জন। বাতাসের গতি ও বাড়ল যেন। সবমিলিয়ে দুর্যোগের ঘনঘটা।

নদীর তীর ধরে পিচ্ছিল পথে এগোই গতি হয়ে ওঠে মন্থর। সাবধানে পা ফেলি। প্রতি পদক্ষেপে ভয়। সঙ্গীদের জন্য চিন্তা বাড়ে। বিশেষ করে ছেলেমেয়ে দুটোর কথা বার বার মনে পড়ছে।

মুহূর্তের মধ্যে চেতনা ফিরে পাই। চিন্তা দূর হয়। সব চিন্তা ভাবনা মুক্তিনাথের পায়ে সমর্পণ করেই তো ঘর থেকে বেরিয়েছি। অতএব দুর্যোগের মুখে সাহস অক্ষুণ্ণ রেখে পথ চলতে হবে।

বৃষ্টির বিরাম নেই। কিছুদূর যেতেই দলের সকলের দেখা পেলাম। বর্ষাতি গায়ে ঐতো সবাই আগে আগে চলেছে। খানিকটা পথ

এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে দেখলাম একটা বিরাট গিরিখাদ। খাদের কিনারায় এসে দেখলাম নিচে বয়ে চলেছে এক খরস্রোতা। পারাপারের জন্য উপরে পাতা রয়েছে সেরেফ একটা আস্ত গাছ। একবার মনে হল ঝড়ে হয়ত গাছটি আড়াআড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। উপর থেকে নিচে নামার পথটি সত্যিই ভয়ের। চওড়াই বড়জোর একফুট আলগা মাটি। কোথাও কোথাও বেশ খানিকটা ধুয়ে নেমে গেছে। পা রাখতে ভয় হয়।

শের বাহাদুর আর বিক্রম আগে মালপত্র নিচে রেখে এল। তার পর একে একে আমাদের হাত ধরে সেই গাছটার কাছে নামিয়ে নিয়ে এল।

এবার আরো শক্ত পরীক্ষার মুখোমুখি হলাম একে গাছটা এবড়ো খেবড়ো। তার উপর কাদায় মাখামাখি। মনে হচ্ছে পা রাখলেই পিছলে যাবে। আর পিছলে গেলে—সে আর না ভাবাই ভাল। নিচে তীব্র জলস্রোত। গভীরতা হয়ত বেশী নয়। তবুও পরিণামের পরিমাপ করা দায়। যাকগে সকল ভাবনা চিন্তার অবসান করে দিয়ে ছেলে একাই পার হয়ে গেল। আমাদের কিন্তু সাহসে কুলোলোনা। দুই কাণ্ডারী শের বাহাদুর আর বিক্রম আমাদের একে একে পার করিয়ে দিল।

এপারে আর তেমন কষ্ট হল না। সহজেই উপরে উঠে এলাম। অর্থাৎ আমরা দানা গ্রামে প্রবেশ করলাম। বৃষ্টি কিছুটা কমলেও হাওয়ার বেগ কিছুমাত্র কমেনি। তাই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। খানিকটা এগোতেই দেখলাম একটা দোতলা বাড়ী নিচতলায় কয়েকজন বিদেশী বসে চা পান করছে। দেখে মনে হল বসত বাড়ী হলেও বাড়ীর একাংশ যাত্রী নিবাস। চল, উঠে পড়, 'একবাক্যে গর্জে উঠে··· যাত্রী সবে।'

সবাই ভিজে একেবারে গোবর। এক্ষুণি জামা কাপড় না পাল্টালে হয়ত ঠাণ্ডা লেগে একটা সাংঘাতিক কিছু—।

দরজার সামনে যেতেই একটা ফুটফুটে যুবতী মেয়ে এগিয়ে এসে আমাদের সাদর আহ্বান জানাল। আমরা আজকের মত এখানে বিশ্রাম নিতে চাই বলাতে মেয়েটা আমাদের দোতলায় নিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দুখানা ঘর দেখিয়ে দিল। ভারী চমৎকার ঘর দু'খানা। তাতে খাট বিছানা এবং আসবাবপত্র পরিপাটি করে সাজানো। এত ভাল ব্যবস্থা কল্পনাও করতে পারিনি।

ভিজে জামা কাপড় পাল্টে যে যার খাটের উপর উঠে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটা লেমন টী আর বিস্কুট নিয়ে হাজির। হাসিমুখে প্রত্যেকের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই আমাদের পাশে বসে পড়ল। চা খেতে খেতে একথা সে কথা অনেক কথাই হলো।

মেয়েটির নাম সুশীল তুলসান। বয়স ১৯। বাবার নাম দুর্গাপ্রসাদ তুলসান। পঞ্চায়েত পরিষদের সদস্য। গ্রাম প্রধান। সুশীলার দাদা একজন পশু চিকিৎসক। জুমসুম এ কর্মরত।

বাড়ীর একাংশে যাত্রী নিবাস একমাত্র সুশীলার আগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। পিতাজী চেয়েছিলেন, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে। ভাল পাত্রও নাকি জুটেছিল। কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসল। সে স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চায়। তাই বাবাকে দিয়ে এই ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছে। সুশীলার এই কাজে দাদারও নাকি সায় আছে।

পথে চলতে চলতে কত ছোটবড় ঘটনা কত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। কোনটা কালক্রমে ভুলে যাই আর কোনটা সারাজীবন স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কোন অবসর মুহূর্তে স্মৃতিপথে যখন পরিক্রমা করি তখন কত কথাই না মনে পড়ে। ঝগড়া আতিথেয়তা স্বার্থপরতা ভালবাসা কোনকিছুই বাদ যায় না।

এক্ষেত্রে সুশীলার মিষ্টি মধুর ব্যবহার এবং আতিথেয়তা ভুলবার নয়। হোলোই বা এটা তার ব্যবসার অঙ্গ। তবুও তুলনামূলক ভাবে বলতে দ্বিধা নেই সুশীলাও অনন্যা। ক্ষণিকের পরিচয়ে তার অস্তিত্বকে

সে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। প্রতিটি কাজে করুণাময়ী মা মমতাময়ী ভগ্নী স্নেহশীলা কন্যা—নারীর বহুধা মমতা মাখানো প্রাণঢালা সেবা দিয়ে সে আমাদের মুগ্ধ করেছে।

দানার উচ্চতা পাঁচ হাজারের বেশী নয়। তবুও তুলনায় শীতটা বেশী মনে হ'ল। বৃষ্টি এবং হাওয়া, এই দুই কারণেও হতে পারে।

রাত ৮টা নাগাদ খাওয়ার টেবিলে ডাক পড়ল। পরিবেশন করলো সুশীলা নিজের হাতেই। রান্নার তারিফ করতেই খুব আনন্দ। বারে বারে এটা সেটা পাতে তুলে দিচ্ছে আর কম খাওয়ার জন্য অনুযোগ করছে। খাওয়া শেষে আরেক চমক। একটা এ্যালমুনিয়মের খালি গামলা নিয়ে এসে হাজির। দু'হাতে আমাদের সামনে তুলে ধরে বললে বাইরে ভয়ানক ঠাণ্ডা। এর মধ্যেই হাতমুখ ধুয়ে নিন।

এর চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডায় অনেক বেশী পয়সা খরচ করে অনেক জায়গায় থেকেছি। কিন্তু সুশীলা আজো অদ্বিতীয়া।

সকাল হতেই আবার যাত্রা শুরুর পালা। সুশীলা একটা চিরকুট হাতে দিয়ে বলল এতে তার দাদার নাম ঠিকানা লেখা আছে। জুম-সুমে গিয়ে যদি কোন অসুবিধায় পড়ি, তার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করি।

—থ্যাঙ্কস্, গড ব্লেস্ ইউ, এ দুটি কথা বলে বিদায় নিলাম।

দুর্গাপ্রসাদ তুলসান এর বাড়ীটা গ্রামের প্রবেশ মুখে। তাই চলা শুরু করে গ্রামের মধ্য দিয়েই এগোতে হচ্ছে। গ্রামটা তুলনায় বেশ বড় এবং পরিষ্কার। ছিমছাম ঘর বাড়ী। বাড়ী সংলগ্ন ফল ও সব্জী বাগান। একটা জিনিস বিশেষ ভাবে নজরে পড়ল—প্রত্যেক বাড়ীতেই গাছভর্তি কমলা লেবু। গাঢ় সবুজ রঙ। এখনো পাক ধরেনি।

দানা গ্রামের পরিধি বেশ কয়েক কিলোমিটার। ঘরবাড়ী বেশীর ভাগ পাথরের। লোকজনের পোষাক আসাকে রঙ ও রুচির ছাপ। সচ্ছল পরিবেশ।

গ্রাম ছেড়ে এগিয়ে চলি। কালীগঙ্গার তীরে তীরে। সামান্য

এগোতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল শুভ্ররত্নখচিত একখণ্ড গিরিশৃঙ্গ ধৌলাগিরি। এ যেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মুক্তিনাথের দুর্গম পথে বারে বারে দেখা দেয় যাত্রীদের। যাত্রীরাও ক্লান্তিভুলে মুগ্ধনেত্রে তাকায়। মুহূর্তে মনে জাগে আনন্দ শিহরণ।

তাই কালে কালে বহু রূপমুগ্ধ অভিযাত্রী এপথে এসেছেন। ধন্য হতে চেয়েছেন রূপসীর রূপকুণ্ডে ডুব দিয়ে।

তবে একথা ঠিক হিমগিরি শৃঙ্গ রত্ন আহরণের চেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশীরাই করেছেন। তাঁরা প্রবল আগ্রহ, পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বারে বারে এপথে এসেছেন। জীবনের মায়া ত্যাগ করে চেষ্টা করেছেন জানবার দেখবার জয় করবার। অবশ্য এসকল প্রচেষ্টা বেশী দিনের পুরানো নয়।

তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে ও নেপালে পর্বতারোহণের অনুমতি বিদেশীদের মিলত না। সম্ভবত ১৯৪৯ সালে নেপাল সরকার প্রথম অনুমতি দিলেন বিখ্যাত পর্বতারোহী মিঃ টিলম্যান কে। সে যাত্রায় মিঃ টিলম্যানের অপর সঙ্গীরা ছিলেন—ইভান্স্ এমলিন্, রবার্ট, সাউনডেস্ এবং প্যাকার্ড।

সেবারে তাঁরা মানাসলু, হিমলচুলী লামজুর হিমল প্রভৃতি গিরিশৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। সেবারে তাঁরা চূড়ান্ত ভাবে সফল না হলেও এ সকল গিরিশৃঙ্গের বহু রহস্য তাঁরা উদ্ধার করেছিলেন।

সেই ধৌলাগিরির প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। ধৌলাগিরি অভিযানে প্রথম এগিয়ে আসেন ফ্রান্সের আলপাইন ক্লাবের হিমালয়ান কমিটি। দলনেতা **Maurice Herzoq** এর নেতৃত্বে ন' জনের একটা দল এই দুঃসাহসিক অভিযানে পা বাড়ালেন। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন **Lionce Terry, Marcal Schats, Jean Cowzy, Gaston Rebuffat, Louis Lachena', Jaqnes Oudet, Marcal Ichac** এবং **Francis De Noyelle** সঙ্গী হিসাবে আটজন অভিজ্ঞ

শেরপাকে নেওয়া হল।

তাঁদের অভিযান শুরু হ'ল কালীগণ্ডকী নদীর গতিপথ ধরে উজানে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হতে তাঁরা একসময় মুক্তিনাথের পথে টুকুচে এসে হাজির হন।

এখান থেকেই তাঁরা ধৌলাগিরির দুর্গমপথে অগ্রসর হন। অতিকষ্টে সুউচ্চ একটা গিরি সঙ্কট অতিক্রম করার পর দেখলেন তাঁদের আরাধ্য ধৌলাগিরি তখনও গগনচুম্বী। তাই সেযাত্রা বাধ্য হয়ে ধৌলাগিরি অভিযানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে আবার টুকুচে ফিরে আসতে হয়।

এর তিন বৎসর পরে ১৯৫৩ সালে এক সুইস অভিযাত্রীদল ধৌলাগিরি অভিযানে অগ্রসর হন। তাঁদের দলনেতা প্রখ্যাত পর্বতারোহী Bernhard Lauterburg. সফলতার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে ছিলেন। তাঁরা হিমবাহ পথে প্রায় ২৫৩০০ ফুট পৌঁছেছিলেন। শিখরে পৌঁছতে আর মাত্র দেড় হাজার ফুট বাকী। বিধি বাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং পথের অগম্যতায় ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

এরপর ধৌলাগিরি অভিযানে এগিয়ে আসেন আর্জেন্টিনিয়ার কয়েকজন পর্বতারোহী। তাঁরা চার বছরের মধ্যে দু'বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অধিকন্তু শেষবারে প্রাণ হারালেন দলনেতা Francisco Ibauex.

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সুইস ও জার্মান পর্বতারোহী দলের যৌথ প্রচেষ্টায় Martin Meir-এর নেতৃত্বে ধৌলাগিরি অভিযান ঘটে। কিন্তু মন্দ ভাগ্য সেবারও অভিযান সফল হয় নি।

আবার সুইস দল এই অভিযানে এগিয়ে আসেন ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে। Max Eiselin-এর নেতৃত্বে। আপ্রাণ চেষ্টা করে এবারো তারা ব্যর্থ হন।

Max Eiselin কিন্তু হার মানবার পাত্র নন। তিনি অসীম সাহস এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে দু'বছর পর আবার অভিযানে এগিয়ে

এলেন। এবারের ব্যবস্থা কিন্তু ভিন্ন, তিনি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগালেন। ১৬০০০ ফুট উঁচু উপত্যকায় প্লেন নামাবার ব্যবস্থা করলেন। তাতে অনেক পরিশ্রম বাঁচল। লোকজন এবং মালপত্র নিয়ে একেবারে বেস ক্যাম্পে উপস্থিত হন।

এবার শুরু হ'ল মরণপণ সংগ্রাম। অবশেষে তু'বছর আগেকার খুঁজে পাওয়া পথে তিনি ধৌলাগিরির ১নং শিখরে অরোহণ করেন।

মোট তেরজন সদস্যের মধ্যে প্রথমবারে মাত্র ৬জন এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তাঁরা হলেন **Peter Diener, Ernst Torrer, Albin Schelbert, Kurt Diemberger** এবং তু'জন শেরপা— নিমা দোরজে এবং নওয়ার দোরজে।

এর ঠিক দশ দিন পর দলের আরো তুজন সদস্য **Hugo Weber** এবং **Michel Vancher** বিশ্বের এই ত্রয়োদশতম উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

এর পরেও কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে। তবে বেশীর ভাগই ক্ষেত্রেই অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।

॥ উনিশ ॥

আবার পথের কথায় ফিরে আসি। দানা ছেড়ে কিছুদূর এগোতেই একটা ঝরণার দেখা মিলল। পাহাড়ের গা বেয়ে নামবার সময় ধারাটি বহুধা বিভক্ত হয়ে ঝরে পড়েছে। তারপর চলার পথের উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে কালীগঙ্গার বুকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে জলধারা অতিক্রম করে এগিয়ে চলি।

ক্রমশঃ পথের প্রশস্ততা কমে আসে। সঙ্কীর্ণ পথে পাথুরে ধাপ। একদিকে খাড়া পাহাড় অন্যদিকে গভীর গিরিখাদ। তার উপর তীব্র চড়াই। অতিকষ্টে এগিয়ে চলি।

চড়াই পথের শেষে বেশ একটা বড় গ্রাম। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। ধাপে ধাপে নেমে গেছে নদীর সমতলে।

গ্রামটির নাম কাক্রে। অনেক ঘরবাড়ী ক্ষেতখামার। ঘরে ঘরে গরু ছাগল হাঁস মুরগী। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু পরিবেশ।

গ্রামটি ছাড়িয়ে খানিকটা পথ এগোতেই একটি সঙ্কীর্ণ গিরিখাত। তার উপর একফালি লোহার ব্রীজ। দু'দিকের পাহাড়কে যুক্ত করেছে।

ব্রীজ পেরিয়ে এপারে চলে এলাম। এবার পর পর দুটি সুড়ঙ্গ পথ। পাহাড় ফুটো করে তৈরী।

চলার পথ কালীগঙ্গার তীরে তীরে। চোখের সামনে কেবল দু'টি রেখা। একটি পথরেখা অন্যটি কালীগঙ্গার প্রবাহের। চলার পথে কালীগঙ্গার কল শব্দগীত অবিরাম প্রেরণা যোগায়।

অবশেষে পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়। উপত্যকার পরিধি বাড়ে। গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করি।

বেলা ১১টা নাগাদ ঘাসা পৌঁছে গেলাম। ঘাসা গ্রামটি ত্রিস্তর লোয়ার, মিডল্, আপার। গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। কারো ঘরের

পাশ দিয়ে কারো উঠোনের উপর দিয়ে। দেখে মনে হয় বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের চারিদিকে ক্ষেত খামারে সবুজের সমারোহ। ঝরণার ধারা ফসলে আনে পুষ্টি ও প্রাচুর্য। ঢালু পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে উপচে পড়া ফসলের ঢেউ। তাকালে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

দুপুরের খাওয়া এই ঘাসাতেই সেরে নিতে হবে। বহুদূর আর সে সুযোগ পাব না। এখন দেখি শের বাহাদুর কোথায় গিয়ে থামে।

আপার ঘাসায় এসে শের বাহাদুর থামল। 'হুসাং লজে' বারাণ্ডায় বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। ভেতরটা দেখলাম একটা হলঘরের মত। একপাশে রান্না, অন্যপাশে খাবার জায়গা। গোল করে আসন পাতা রয়েছে। তাতে অনেকেই বসে পড়েছেন। বিক্রমের পরামর্শে আমরাও ভিতরে গিয়ে জায়গা দখল করে নিলাম। খাবার রেডি হতে নাকি আরো সময় লাগবে। হুসাং লজের দিদি কিন্তু শৃঙ্খলা মেনে চলেন। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সারভ।

অবশেষে সাড়ে ১২টায় খাবার মিলল। ভাত, ডাল তরকারী। মাথা পিছু সাত টাকা।

খাওয়া শেষ। ২টা নাগাদ আবার যাত্রা সুরু। চড়াই উৎরাই বিশেষ নেই। এখানে দেখলাম ঝরণা ধারাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোথাও বা চাষ আবাদের কাজে, আবার কোথাও স্নান কাপড় কাচা ইত্যাদি দৈনন্দিন প্রয়োজনে। এক জায়গায় দেখলাম পাথরের চৌবাচ্চার মধ্যে জল ধরে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে জল নিয়ে অনেকে স্নান করছে। এ দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দু' একজন সদস্য স্নানের ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু কঠোর নেতৃত্ব কিছুতেই মত দিল না। অধিকন্তু তাড়া দিল—দ্রুত এগিয়ে যেতে।

ঘাসা থেকে লেতের পথে এগিয়ে চলেছি। কোথাও বনের মধ্য দিয়ে ছায়া ঘেরা পথে, আবার কখনও পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা পথে। আঁকা বাঁকা পথে আবার সেই ঝরণা ধারার উৎপাত। পাহাড় থেকে নেমে পথের উপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে। নিচে গিয়ে মিশেছে

কালীগণ্ডকীর প্রবাহে।

নির্জন দুপুর। ছায়া স্নিগ্ধ পথে দু'একটা পাখীর ডাক। বাতাসে দোলায়িত গাছের পাতায় শিরশির শব্দ। তার সঙ্গে তাল রেখে আমরাও চলেছি। নির্বাক নিঃশব্দ। শুধু পদভারে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি, বড়জোর ক্লান্ত দেহের চাপা নিঃশ্বাস। প্রকৃতির ছন্দে জীবনের ছন্দ মিলে মিশে একাকার। মধুর সংযোজন। সার্থক পরিপূরক।

বনপথের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছলাম। সামনেই 'লেতে'। মাঝখানে শুধু লোহার ব্রীজ! উৎরাই পথে খানিকটা নেমে ব্রীজের সমতলে চলে এলাম। ব্রীজের তলায় বহু নীচে কালীগণ্ডকীর প্রবাহ। অপ্রশস্ত। তীব্র খরস্রোতা। ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে নীচে তাকাতে ভয় হয়।

ব্রীজ পার হতেই লেতে গ্রামের সুরু। ব্রীজের পাশে মাত্র কয়েক ঘর বসতি। এখান থেকে পথ তীব্র চড়াই।

লেতে গ্রামটা তিনভাগে বিভক্ত। ব্রীজের কাছটা নিম্ন লেতে। তারপর চড়াই পথে উঁচু উপত্যকায় উঠে মধ্য লেতে। পরের অংশটা আপার লেতে। অনেকটা ঘাসার মত।

অতি কষ্টে চড়াই ভেঙে উপরে উঠলাম। এবার বহু দূর পর্যন্ত পথ একটানা সমতল। বিরাট প্রশস্ত উপত্যকা। চারিদিকে ক্ষেত খামার, ঘরবাড়ী।

এই উপত্যকার প্রান্তে কালীগণ্ডকীর তীরে এসে চমকে উঠলাম। কত নীচে কত গভীরে কালীগণ্ডকীর প্রবাহ। এরকম গভীর গিরিখাদ হিমালয়ের অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। প্রস্থেও নেহাৎ কম নয়। এপারে বড় গাছপালা বিশেষ নেই। ওপারে কিন্তু গভীর জঙ্গল। এপার থেকে মনে হয় বিশাল একখণ্ড সবুজ তৈলচিত্র আকাশ থেকে সোজা নেমে গেছে একেবারে পাতালে, কালীগঙ্গার তীরে। যেখানে তীব্র স্রোত পাথরে ধাক্কা খেয়ে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছে। যেন নাগ সরোবর। শত সহস্র নাগ প্রচণ্ড

আক্রোশে ফণা তুলে অবিরাম গতিতে দাপাদাপি করছে। কি ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য! অপরূপ বীভৎসতা!!

গ্রামের মধ্য দিয়ে পথ। প্রায় সমতল। ইতস্ততঃ কয়েক টুকরো বিরাট বিরাট পাথর। খানিকটা অংশ মাটির মধ্যে প্রোথিত।

শের বাহাদুরের ইচ্ছা কালোপানি গ্রামেই আজকের যাত্রা বিরতি হোক। যেখানেই হোক আস্তানাটা যেন ভাল হয়। শের বাহাদুর কোন কথা না বলে শুধু একটু হাসল। ভাবখানা এমন—দেখ না কেমন তাক্ লাগিয়ে দিই।

কালোপানি গ্রামে ঢুকে বেশীদূর এগোতে হ'ল না। তাছাড়া গ্রামটাও খুব ছোট। সে তুলনায় যাত্রী নিবাস কিন্তু কম নয়।

আমাদের লজ "সি ইউ"। ভারী সুন্দর ব্যবস্থা। বিছানা-পত্র খাবার দাবার সব কিছুতেই আধুনিকতার ছাপ। চার্জ তেমন একটা বেশী নয়। সিটভাড়া ২ টাকা, খাওয়া ৭ টাকা, চা এক কাপ ১ টাকা। সময়কাল সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

খাবার টেবিলে অনেক বিদেশীকেও দেখতে পেলাম। খাবারও দেখলাম রকমারী। যে যেমনটি চায়।

দেওয়ালে মেনু লিষ্ট টাঙানো। দলের সকলের ইচ্ছা মুখ পাল্টাবার। বেশ তাই হবে। হুকুম করলাম—এগ্ চাউমিন্ আর মাটনকারী। জনপ্রতি দশ টাকা। এপথে টাকা থাকলে সব কিছুই মেলে। বিদেশী ট্যুরিষ্ট আগমনের এও একটা কারণ। ট্রেকিং-এর দুর্গম পথে এতেন সুব্যবস্থা ভারত হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোথাও নেই।

অবশ্য নেপালের অর্থনৈতিক কাঠামো বিশেষতঃ ট্যুরিষ্ট-নির্ভর। জনসাধারণের একটা বিরাট অংশের যা কিছু রুজি রোজগার এই ট্যুরিষ্টদের কেন্দ্র করে।

খাওয়ার টেবিলেই আলাপ হল একজন জার্মান ট্যুরিষ্টের সঙ্গে। নাম বলল এডগার রাফেল, মোটর তৈরীর কারখানায় কাজ করেন,

ফিটার। খাবার দিতে বিলম্ব আছে। তাই প্যাণ্টের বোতাম সেলাই করতে লেগে গেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার অভ্যেসটা চাড়া দিয়ে উঠল। আলাপ আলোচনায় টেনে আনলাম তাকে। এডগার দক্ষ মিস্ত্রী। স্বাবলম্বীও বটে। নিজের সব কাজ নিজেই করেন। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।

এডগারের কথা শুনে জার্মানীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও খানিকটা আঁচ পাওয়া গেল। সেখানে অন্যকে দিয়ে নিজের কাজ করানোর কথা কেউ ভাবতেই পারে না। আমাদের টাকার হিসাবে অন্ততঃ মাসে পাঁচ হাজার টাকা হলে একটা লোক শাক ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। হোটেলে একবেলা একটু ভালমন্দ খেতে গেলে কমপক্ষে একশ টাকা লাগে। এক কাপ কফির আরাম পেতে গেলে দশ টাকা। তবে রোজগারও সেরকম। লনে ঘাসের পরিচর্যা করলেও মাসে ৫।৭ হাজার টাকা আয়।

এডগার চলনসই ইংরেজী জানে। তাই আলোচনা চলতে লাগল। বললাম—তাহলে ছুটি ছাটায় তোমাদের বিদেশে যাওয়াই তো লাভ। কম খরচে কিছুদিন আরামে কাটিয়ে আসতে পারো।

একটু থেমে এডগার বললে—তা অবশ্য ঠিক। তবে কি জান, যত মাইনেই পাই না কেন মাসের শেষে কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। সঞ্চয় একেবারে শূন্য। বেড়াতে গেলে মিনিমামটাওতো দরকার।

কথার ফাঁকে অন্য প্রসঙ্গে চলে আসি। আচ্ছা তোমাকে তো একাই দেখছি। তবে কি—বলতে আর হল না,—ইয়েস আই অ্যাম ব্যাচেলার।

—বয়স তো—। এবারেও কথা শেষ করতে হল না।

—তেত্রিশ।

—এই বয়সেও তুমি—

—কি করব বল। আমি তো কোন একটা উচ্চপদে চাকরী করি

না। সাধারণ একজন মিস্ত্রী। কম মাইনের পুরুষকে আমাদের সমাজে মেয়েরা পছন্দ করে না। এডগারের কথা শুনে অবাক হলাম। ক্ষণিকের পরিচয়—কত সহজে একজন বিদেশীর কাছে অকপটে সত্য উপলব্ধিটুকু তুলে ধরল। জান, জার্মান মেয়েরা পাত্র হিসাবে বিদেশীদের বেশী পছন্দ করে, বিশেষতঃ ইণ্ডিয়ান ও পাকিস্থানী। ভালবাসায় নাকি ওদের জুড়ি নেই।

—তা, তোমার কি ধারণা?

—এখন আমারও তাই ধারণা।

—এখন মানে?

—গত বছর আমার এক ডিভোর্সী বোনের সঙ্গে পাকিস্থানের একটা ছেলের বিয়ে হয়েছে। দুজনেই একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে চাকরী করে। ছেলেটা ইঞ্জিনীয়ার, আমার বোন টেলিফোন অপারেটর। দু'জনের মধ্যে কোনদিন কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি; যদিও আমার বোন ভীষণ বদরাগী। কথাবার্তা আর এগোল না। টেবিলে খাবার এসে পড়ল। এডগারের জন্য এগ্ টোষ্ট আর ভেজিটেবেল স্যুপ্।

খাওয়ার পর জল পেটে পড়তেই শীত যেন সারা গায়ে জাঁকিয়ে বসল। খাওয়া শেষ হতেই যে যার বিছানার দিকে পা বাড়াল।

॥ কুড়ি ॥

সকাল সাতটায় আবার যাত্রা সুরু। 'সি ইউ' লজ থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে ঘুরতেই চোখের সামনে এককালি বরফের চাঁই। ধৌলাগিরি শৃঙ্গ। যেন হিমালয়ের মাথায় এককালি সাদা কাপড়ের জলপট্টি! ভোরের আকাশে ধৌলাগিরিকে কি অপরূপই না দেখাচ্ছে। এখান থেকে মনে হয় খুব কাছে। যেন হাতের নাগালের মধ্যে।

চলা শুরু। চড়াই নেই, বরং সামান্য উৎরাই। খানিকদূর এগোতেই কালীগঙ্গার তীরে এসে পড়লাম। রাস্তা ভাঙ্গা। তাই পথ আপাততঃ কালীগঙ্গার বুকের উপর দিয়ে। বিশাল চওড়া বালুকাময় বেলাভূমি। তারি মধ্যদিয়ে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে কালীগঙ্গা বয়ে চলেছে।

নদী উপত্যকার উপর দিয়ে চলেছি। পথের চিহ্ন শুধু পায়ে চলার দাগ। জলস্রোত এড়িয়ে বালিয়ারীর উপর দিয়ে এগোই। নদীর উভয় তীরে গাঢ় সবুজ বন। দিগন্ত প্রসারী। সূর্য কিরণে বালি উপত্যকায় বর্ণালী পরিবেশ। সূক্ষ্ম রত্নখণ্ডের মত বালি চিক চিক করছে। কালীগঙ্গার স্বচ্ছধারার উচ্ছলতায়ও আলোর দ্যুতি। যেন বিশাল বনানী-কণ্ঠে অপরূপ রত্নহার।

চলতে চলতে একসময় নদী তীরে উঠে আসি। জলধারা একেবারে তীর প্রান্তে এসে গেছে। খানিটা চড়াই উৎরাই ভেঙে আবার নেমে এলাম কালীগঙ্গার প্রশস্ত বেলাভূমিতে।

এবার শুরু হল হাওয়ার দাপট। এই ঝড়ো হাওয়ার কথা আগেই শুনেছি। এর ভয়াবহতা এবার টের পেলাম। দাঁড়াতে দিচ্ছে না। ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। জুমসুম পর্যন্ত এ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এখানে এই তীব্র হাওয়া নাকি সারা বছরই চলে।

লারজুমের পথে কালীগঙ্গার উপত্যকা ধরে চলেছি। এখানকার

নদী উপত্যকা অনেকটা গড়ের মাঠের মত প্রশস্ত। তারই উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি! দূরে লারজুম গ্রামটি দেখা যাচ্ছে।

বেশ খানিকটা পথ এগোতেই বুঝতে পারলাম। ভুল, মহাভুল করে ফেলেছি। খানিকটা চড়াই উৎরাই বাঁচাতে গিয়ে স্থানীয় যাত্রীদের কথা শুনে, তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে এই সঙ্কট।

এই নদী উপত্যকায় কালীগঙ্গার স্রোতধারা ৭।৮ টা ভাগে প্রবাহিত। প্রথম ৩।৪টি কোন রকমে পার হলাম। হাঁটু সমান জল। জলের নীচে ছোট বড় অসংখ্য পাথর। শেওলা ধরা। স্রোতের তীব্রতা কম। তাই পায়ে পায়ে স্থানীয় লোকের সাহায্যে পার হলাম।

সমস্যায় পড়লাম মূলস্রোতের কাছে এসে। কোমর সমান জল স্রোতের গতিও তীব্র। এখন উপায়? সাথীদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তারা হয়ত চড়াই পথে পাহাড়ের উপর দিয়ে লারজুমে গিয়ে নামবে। কাঁধে বোঝা নিয়ে কোন রকম ঝুঁকি হয়ত নেয়নি। বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণও হয়ত তাদের সঙ্গে রয়েছে।

আবার ফিরে গিয়ে সে পথে যেতে হলে অনেক হাঁটতে হবে। কিছুতেই আজ জুমসুম পৌঁছানো যাবে না। লারজুম কিম্বা দেবী-থানেই রাত কাটাতে হবে।

এখান থেকে উপরে পাহাড়ের গায়ে চলার পথটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুতেই ওঠা যাবে না। একদম দেওয়ালের মত খাড়াই। অতএব সে চিন্তা বৃথা। অগত্যা জলের উপর দিয়ে কিভাবে পার হওয়া যায় সেটাই ভাবতে লাগলাম।

আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে দুজন স্থানীয় যুবক এগিয়ে এল। তারা যা বলল তার মর্মার্থ হ'ল—জামা কাপড় আমাদের ভিজবেই। তবে ভয় নেই, তারা হাত ধরে পার করে দেবে। শুধু তাদের একটা হাত আমাদের শক্ত করে ধরে থাকতে হবে।

যাইহোক মুক্তিনাথকে স্মরণ করে নেমে পড়লাম। পারও হলাম

কিন্তু মনে আতঙ্ক লেগেই রইল। অধিকন্তু মনে পড়ল অনুরূপ আরেকটি ঘটনা।

সেবার পঞ্চ কেদার পরিক্রমায় বেরিয়ে মদমহেশ্বর দর্শন করে ফিরছি। যাব উখীমঠ হয়ে চোপতা ও তুঙ্গনাথ। লেঙ্ক এসে স্থানীয় কিছু লোকের পরামর্শে এরকম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছিল।

ওপথে সাধারণতঃ লেঙ্ক কালীমঠ গুপ্তকাশী হয়ে উখীমঠ। তারপর চোপতা হয়ে তুঙ্গনাথ। লোকের পরামর্শে সময় ও পরিশ্রম বাঁচাতে গিয়ে আমরা লেঙ্ক থেকে নিচে নেমে আকাশ গঙ্গা পেরিয়ে মুনসুনা গ্রাম হয়ে উখীমঠ পৌঁছবো ঠিক করলাম। তাতেই ঘটল এরকম বিপত্তি। তাই স্বাভাবিক কারণেই কালী গঙ্গার পরিস্থিতি আকাশ গঙ্গার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলল।

কালী গঙ্গার প্রশস্ত বেলাভূমির উপর দিয়ে চলেছি। পথের চিহ্ন কিছুই নেই। মাঝে মধ্যে শুধু পায়ে চলা দাগ। অনেকটা আন্দাজ করে এবং অদূরে গ্রামের অবস্থান লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম।

প্রথমে যে গ্রামটায় এসে উঠলাম তার নাম লারজুম। লারজুমের পর দেবীথান। এই গ্রামগুলি কালী গঙ্গার বুকের উপর গড়ে উঠেছে। ভয় হয় কোন দিন না বর্ষায় কালীগঙ্গার স্ফীত জলধারা গ্রামগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

লারজুম আর দেবীথান এই গ্রাম দুটি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কার কোথায় সুরু আর শেষ বোঝা মুস্কিল। যাইহোক দেবীথানেই আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা হবে শের বাহাদুর বলে দিয়েছে।

দেবীথানে শের বাহাদুরের পরিচিত একটা বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। দুপুরের আহার এখানেই মিলবে। তৈরী করতে ঘণ্টা খানেক সময় লাগবে। তা লাগুক। বরঞ্চ ভালই হ'ল। এখন চড়চড়ে রোদ। ভিজে জামা কাপড়গুলো শুকিয়ে নেওয়া যাবে।

ডাল, অল্প ভাজা, লাউয়ের ঝোল, ক্ষিদের মুখে সবই অমৃত। হলোই বা সাত টাকা। আন্তরিক ঘরোয়া পরিবেশে ক্ষুধার অন্ন

টাকা দিয়ে মাপা যায় না।

যাই হোক আবার যাত্রা সুরু। খানিকটা গ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আবার কালীগণ্ডকীর উপত্যকা ধরে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। তারই উপর দিয়ে কালীগণ্ডকী বয়ে চলেছে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে। এখানে ছড়িয়ে আছে ছোটছোট পাথর। বিভিন্ন আকার আর বিচিত্র তাদের রঙ। তবে বেশীর ভাগ কালো। এখান থেকেই নাকি সংগ্রহ করা হয় শালগ্রাম অর্থাৎ নারায়ণ শিলা। কালীগণ্ডকীর বুকে এদের জন্ম, তাই অপর নাম কালীশিলা। বন্ধুবর হিমাংশু চক্রবর্তী বারে বারে বলে দিয়েছে ওর জন্য একটা শিলা নিয়ে যেতে। তাতে নাকি বহুদিনের একটা ইচ্ছা পূর্ণ হবে!

একটা নয়, ৪।৫টা পাথর সংগ্রহ করে নিলাম। একাজে বিক্রম সিং যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যে কটা নিলাম সব কটাতেই গোল সাদা দাগ। ওটা নাকি উপবীত। এটাই নাকি প্রকৃত নারায়ণ শিলার চিহ্ন।

খানিকদূর এগোতেই একটা ঝরণাধারার মুখোমুখি হলাম। পাশের গিরিশিরা থেকে নেমে এসে কালীগঙ্গায় মিশেছে। তার উপর কয়েকখানা কাঠ ফেলে পুল তৈরী করা হয়েছে।

পুলটা পেরোতেই টুকুচে গ্রামের সুরু। টুকুচে কথাটা এসেছে টুকুচে শৃঙ্গ থেকে। এই গ্রাম সংলগ্ন পর্বতমালার তুষারশুভ্র সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম টুকুচে।

টুকুচে গ্রামটি বেশ বড়। বাড়ীঘরদোরও প্রচুর। কাঠের এবং পাথরের বড় বড় বাড়ী। অফিস, স্কুল, পোষ্ট অফিস, হাসপাতাল, দোকানপাট সবই আছে। এক কথায় বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। আধা শহরও বলা চলে।

টুকুচের চারিদিকে বিশাল ঢালু উপত্যকায় সবুজের সমারোহ। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। ঝরণার জলধারার গতিপথ বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে নানান

প্রয়োজনে। টুকুচের সমৃদ্ধির মূলে বিশাল আবাদী উপত্যকা এবং সারা বছর ধরে কালীগন্ডার অকৃপণ প্রবাহ।

লারজুং থেকে টুকুচে পর্যন্ত সমগ্র বসতি অঞ্চল কালগণ্ডকীর বুকের উপরই কালক্রমে গড়ে উঠেছে। তাই কালীগণ্ডকীর প্রবাহ থেকে গ্রামগুলির উচ্চতা সামান্যমাত্র।

ধৌলাগিরি এবং অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয়ের প্রথম অভিযান এই টুকুচে থেকেই সুরু হয়েছিল। তাছাড়া লামজুর হিমল, অন্নপূর্ণা হিমল, হিমলচুলী, মানাসলুর প্রভৃতি সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ অভিযানের ইতিহাসে টুকুচের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

টুকুচে ছাড়িয়ে মার্ফার দিকে এগিয়ে চলেছি। ঝড়ো হাওয়ার বেগ ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলেছে। লারজুং থেকে শুরু করে জুমসুমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই হাওয়ার অস্তিত্ব বিরাম বিহীন। শুধু সকালের দিকে ২।৩ ঘণ্টা ছাড়া।

মার্ফার পথে যত এগিয়ে চলেছি ততই মনে হচ্ছে দিগন্তবাপী সবুজ গিরিমালা ক্রমশঃ যেন ধূসর হয়ে আসছে। বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে শস্যক্ষেত, সবুজের সমারোহ চলমান রেলের কামরা থেকে পশ্চাতে পলায়মান দৃশ্যের মত ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এককথায় টুকুচে থেকে বিরাট এক পরিবর্তন লক্ষণীয়।

মুক্তিনাথ নেপালের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। অর্থাৎ প্রায় তিব্বত সীমান্তে। জিলা মুস্তাং। টুকুচে ছাড়িয়ে মার্ফা গ্রামের প্রান্ত থেকেই মুস্তাং জিলার সুরু।

এখান থেকে সব কিছুতেই যেন একটা বিরাট পরিবর্তনেরও সুরু। যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, তেমন মানুষ, তার ধর্ম এবং জীবন ধারণের রীতিনীতি। সব কিছুতেই তিব্বতীয় প্রভাব। কিছুকাল আগেও এসব অঞ্চল তিব্বতের শাসন ব্যবস্থার আওতায় ছিল। কালীগণ্ডকীর অববাহিকা ধরে এই পথে তিব্বত ও নেপালের মধ্যে চলত ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য বিনিময়। ব্যবসায়িক কারণে টুকুচে, মার্ফা জুমসুম,

সিয়াঙ, ডেরোক প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু নেপাল সরকারের কর্তৃত্ব এসব অঞ্চলে পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ব্যবসায় ভাঁটা পড়ে। তারপর তিব্বতে চীনা শাসন কায়েম হবার পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এখন এখানকার লোকেদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজ কারবার সম্পূর্ণ দক্ষিণমুখী। নেপালের অন্যান্য অঞ্চল কিংবা ভারতের সঙ্গে।

এবার মার্ফা গ্রামে প্রবেশ করি। পথের ধারে দেওয়ালে এমন কি পাহাড়ের গায়েও সারি সারি চক্র সাজানো। বৌদ্ধ ধর্মচক্র। হাত দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চলি। মিষ্টি মধুর ধ্বনি তরঙ্গে চলার পথ মুখরিত হয়।

বিরাট তোরণের মধ্য দিয়ে গ্রামের প্রবেশ পথ। পথের ধারে কাঠ ও পাথরের বড় বড় বাড়ী, দোকান পাট। ঘরের দেওয়ালে প্রাচীরে অসংখ্য চিত্র আঁকা। বাড়ীর কাঠের দরজা জানালা কারুকার্য মণ্ডিত। এখানকার জনবসতি খুব ঘন। অবস্থা সচ্ছল হলেও পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর।

মার্ফার শেষ প্রান্তে একটা পাহাড়ী নদী পঙ্ক্যাখোলা। পুল পেরিয়ে খানিকটা এগোতেই আরেকটা গ্রাম সিয়াং। সিয়াং গ্রামের পরিধি পশ্চিমে পাহাড়ের গা বেয়ে মাথার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাস্তা থেকে ঘর বাড়ীগুলো যেন পটে আঁকা ছবি।

চলার পথে ঝড়ো হাওয়া ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বাতাসের এ হেন কানফাটা শোঁ শোঁ গর্জন অন্য কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

জুমসুমের প্রবেশ পথে ডানদিকে একফালি মাঠ। এয়ার স্ট্রীপ। ছোট প্লেন যাতায়াত করে। পোখরা কিম্বা কাঠমাণ্ডু থেকে এখানে প্লেনেও আসা যায়। মুক্তিনাথের পথে যাঁরা পরিশ্রম বাঁচাতে চান তাঁরা প্লেনে জুমসুম এসে মুক্তিনাথ দর্শন করে আবার প্লেনেই ফিরে যান। তবে যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হেঁটে এসে ফেরবার পথে প্লেনে ফিরে যান। প্লেনে জুমসুম এসে মুক্তিনাথ দর্শন অনেকটা শোনমার্গ

বালতাল হয়ে অমরনাথ দর্শনের মত। পাকা আমের বদলে আমের গন্ধযুক্ত ট্যাবলেট খাওয়া।

আমার এই উক্তিতে যদি কেউ ক্ষুব্ধ হন তাঁকে জানাই এই উপলব্ধিটুকু একান্ত ব্যক্তিগত। আমি মনে করি তীর্থ পরিক্রমাই হচ্ছে সার্থক তীর্থদর্শন। হিমালয়ের অপরূপ রূপ রহস্যের মধ্য দিয়ে পরিক্রমা শেষে দেব দর্শন। যেন সোনার হাতে সোনার চুড়ি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি। অঙ্গাঙ্গী অবিচ্ছেদ্য। যেন সুরের এক মিলিত 'সিম্ফনী'।

॥ একুশ ॥

জুমস্থুম। উচ্চতা প্রায় ৯০০০ ফুট। প্রবেশ পথে খানিকটা এগোলেই পর পর কয়েক খানা হোটেল। তারই একখানা মুন লাইট। সদলে উঠে পড়লাম। রাস্তায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এত হাওয়ার দাপট। জুমস্থুমের এদিকটা সবে গড়ে উঠছে। পুরনো জুমস্থুম গ্রামটা হচ্ছে নদীর উপর কাঠের পুল পেরিয়ে।

আমরা এখন ওপারে যাব না। এখানে এই মুনলাইট হোটেলেই আজকের যাত্রা বিরতি।

জুমস্থুম বেশ বড় জায়গা। কালীগণ্ডকীর উপত্যকা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ উপত্যকায় প্রচুর ঘরবাড়ী, অফিস, দোকান পাট, ডাকঘর হাসপাতাল। সহরের স্বাচ্ছন্দ্য এখানে বর্তমান।

আজ একবার চেক পোষ্টে যাওয়া দরকার। ভারতীয় পুলিশ দপ্তর কিম্বা গেজেটেড অফিসার প্রদত্ত সিটিজেনসিপ সার্টিফিকেটটা দেখিয়ে আসতে হবে।

আমাদের হোটেলের পাশেই এয়ার অফিস। আরেকটু এগিয়েই চেক-পোষ্ট। গিয়ে দেখলাম তেমন কড়াকাড় কিছু নেই, ভারতীয় তীর্থ যাত্রাদের নাকি ওরা দেখলেই চিনতে পারে। আমাদের কাগজ-পত্র কিছু দেখতেও চাইল না।

যাক গে, এখন আর ঘোরাঘুরি নয়। তাই হোটেলে এসে বিশ্রাম নিই। কাল সকালেই স্থুরু হবে চূড়ান্ত সংগ্রাম। ক্লান্তিকর চড়াইপথে, মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথে।

ভোর হতেই আবার এগিয়ে চলা। কাঠের পুল পেরিয়ে অপর-পারে চলে এলাম। পুরনো জুমস্থুম গ্রাম। ঘরবাড়ী বেশীর ভাগ পাথরের। উঠোন সাধারণত ভিতরের দিকে। তাও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রচণ্ড হাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিশ্চয়। ছাগল

ভেড়া হাঁস মুর্গী প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই রয়েছে। মার্ফা ছেড়ে আসার পর আবাদের চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের গায়ে নেই কোন গাছপালা। ক্রমশ যেন হিমশীতল তুষার মরুতে প্রবেশ করছি।

জুমসুম গ্রাম ছাড়িয়ে কালীগণ্ডকীর বুকে নেমে আসি। বালিচরের উপর দিয়ে চলা। আমরা এগোই কালীগঙ্গা নামে। স্বচ্ছ অমৃত ধারা। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে শত সহস্র ছোট ছোট পাথর। বহু আকার বহু বর্ণ।

বিস্তীর্ণ নদী উপত্যকার বুক চিরে পথ রেখা। ডাঁয়ে বাঁয়ে ধূসর রুক্ষ গিরিশ্রেণী। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। চলার পথে হঠাৎ বাধা পাই। কালীগঙ্গার উচ্ছল প্রবাহ পথ আগলে দাঁড়ায়। আমরা সসম্ভ্রমে, পাথরে পাথরে, পায়ে পায়ে জলধারা অতিক্রম করি।

খানিকটা এগিয়ে নদীর উপত্যকা ছেড়ে আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা। তারপর ডান দিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সামান্য চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে আবার নদীর বুকে নেমে এলাম। ডান দিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ। বাঁয়ে কল্লোলিনী কালীগঙ্গা।

নদী উপত্যকায় পাহাড়ের দিকে একটা মাত্র ঘর। একটা মাত্র পরিবার। তাদের নিয়েই নাকি সম্পূর্ণ একটি গ্রাম। একবেণী। গৃহকর্তা বাড়ীর সামনে খাটিয়ার উপর বসে আছেন। যাত্রী দেখলেই দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে আহ্বান জানান। হয় চা নয় ছাং। এ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। চা পানের সঙ্গে ক্ষণিকের বিশ্রাম। তারপর আবার পথ চলা। এবার কাকবেণীর পথে। নদীর উপত্যকা ধরে সোজা এগিয়ে যেতে হবে।

কাকবেণী মুস্তাং জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম। মুস্তাং পুরোপুরি তিব্বত সীমান্তে। একদিকে মানাং ভোট, অন্যদিকে ডলপো। কাকবেণী, মুক্তিনাথ ছাড়া উত্তরে তিব্বত সীমান্তে আরো কয়েকটা গ্রাম রয়েছে। তবে প্রত্যেকটা গ্রামই ধূসর রুক্ষ পর্বত শীর্ষে। দুর্গমও বটে। ইচ্ছা

ছিল দু'একটা গ্রাম ঘুরে আসার। কিন্তু শের বাহাদুরের মুখে যা শুনলাম তাতে আর ভরসা হল না। এ সব অঞ্চলের লোকেরা তিব্বতী ভাবাপন্ন। এই রুক্ষ পরিবেশে চাষ আবাদের সুযোগ-নগণ্য। তাই জীবিকার জন্য প্রয়োজনে তারা নৃশংস আচরণেও দ্বিধা করে না। তবে বর্তমান নেপাল সরকারের কঠোর শাসনে আজকাল পরিস্থিতি অনেক ভাল।

একবেণী থেকে দুই কিলোমিটার দূরে কাকবেণী। কালীগণ্ডকীর উপত্যকা সংলগ্ন। এই কাকবেণী নামকরণের একটা কাহিনী প্রচলিত। একবার গ্রামের লোকেরা মহা ধূমধাম করে মহেশ্বরের পূজার আয়োজন করল। প্রচুর ফলমূল নৈবেদ্য জড় হ'ল। খাদ্যের এ হেন আয়োজন দেখে আকাশে উদয় হল অসংখ্য কাক। একটি কাক হঠাৎ নেমে এসে কিছুটা খাবার ঠোঁটে নিয়ে উড়ে গেল। খাবারের লোভে ঐ কাকটাকে তাড়া করল আরেকটি কাক। শূন্যে উভয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে একসময় দুজনেই এসে পড়ল কালী গণ্ডকীর জলপ্রবাহে। সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হল অপরূপ দু'টি হংসে। তারপর মুহূর্তমধ্যে হংসদুটি মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই থেকে এস্থানের আরেক নাম হংসতীর্থ। তবে কাকবেণী নামটাই বিশেষভাবে প্রচলিত।

আমরা কাকবেণীর পথে যাব না। সোজা কাকবেণী গেলে তারপর ডাইনে চড়াই পথে আবার মুক্তিনাথের পথ ধরতে হবে। তার চাইতে এই একবেণী থেকে ডাইনে পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথে উঠে গেলে সময় এবং দূরত্ব বেশ কিছুটা কমবে। প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিনাথ দর্শন। তাই কালবিলম্ব না করে সে পথেই এগিয়ে চললাম। কাকবেণী না হয় ফেরার পথেই যাওয়া যাবে।

ফেরার পথে তাই বাঁয়ে একবেণীর পথ না ধরে ডাইনে কালী-গণ্ডকীর উপত্যকা দিয়ে নেমে গিয়েছিলাম। নীচে নেমে কাকবেণী গ্রামের প্রবেশ পথে মনে হল যেন তোরণ দ্বার দিয়ে কোন এক দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারে প্রবেশ করছি। পাথরের বাড়ী। গায়ে গায়ে

লাগানো। সারি সারি বাড়ীর পাশ দিয়ে সরু বাঁধানো রাস্তা। কাকবেণী ঘন বসতি অঞ্চল। অধিকাংশ তিব্বতী। শের বাহাদুরের ইচ্ছাই ছিল না কাকবেণী হয়ে আসার। কথায় কথায় কারণটাও বলে ফেলল। কাকবেণীর লোকেরা নাকি মোটেই বিশ্বস্ত নয়। তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান অঙ্গ মদ আর জুয়া। যাই হোক কোথাও না থেমে জুমসুমের পথে এগিয়ে চলি।

একবেণী থেকে চড়াই পথে উঠতে গিয়ে দূরে কাকবেণী গ্রামটা নজরে পড়ল। কালীগণ্ডকীর বিশাল উপত্যকার গায়ে। এই কাকবেণীর অদূরে কালীগণ্ডকীর সঙ্গে আরেকটি পাহাড়ী নদী এসে মিশেছে। কালীগণ্ডকীর উভয় তীরে বৃক্ষলতাহীন ধূসর রুক্ষ পর্বতমালা। এ যেন আরেক রূপ। অন্তহীন ধোঁয়া ধূসর গালিচার আবরণ দিগন্তব্যাপী পর্বতমালার গায়ে।

চড়াইপথে গিরিশীর্ষে বিশাল এক প্রান্তরে এসে পৌঁছাই। প্রান্তরের বুক চিরে পায়ে চলা গভীর দাগ। বিশাল গিরিশিরে যেন দাঘ সিঁথি।

ক্লান্তিহীন সমতল পথে মহানন্দে পথ চলি। আমরা মুক্তিতীর্থের সিংহদুয়ারে এসে গেছি। মাঝখানে আর একটিমাত্র গ্রাম। দেবস্মৃতি মনে শিহরণ জাগায়। আনন্দে গতি বাড়ে।

প্রান্তরের প্রান্তসীমায় পৌঁছতেই গ্রামটার কাছাকাছি চলে এলাম। পাহাড়ের ঢেউ খেলানো উপত্যকায় বেশ ছড়ানো ছিটানো। গ্রামটার চেহারা কিন্তু অদ্ভুত। এপথে এ ধরণের গ্রাম আর নজরে পড়েনি।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গ্রামের অবস্থান। মনে হয় গ্রামটি কয়েকটা গ্রামের সমষ্টি। চারিদিকে পাথরের ঘরবাড়ী। মাঝে মাঝে বিরাট অট্টালিকা। যেন রাজপ্রাসাদ। শের বাহাদুরের কাছে শুনলাম—রাজপ্রাসাদই বটে। তৎকালীন রাজা কিম্বা সর্দারদের নিজ নিজ বাসভবন। কালের প্রবাহে কালীগণ্ডকীর জলে ভেসে গেছে অতীতের

সেই রাজকীয় আড়ম্বর। তাই আজ শুধু কাঠামোটুকু দাঁড়িয়ে আছে। ভগ্ন জীর্ণ দশা। সেদিনের সেই কলকোলাহলও থেমে গেছে। চারিদিক নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ।

ক্রমশঃ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি। দৈন্যদশা যেন আরো প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রামের লোকসংখ্যা মনে হল খুবই কম। বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ।

এসব গ্রামে চাষ আবাদ খুব একটা হয় না। রুক্ষ উষর মাটি। অতীতে রবরবার কারণ ছিল তিব্বতের সঙ্গে ভারত নেপালের ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা। এপথে তিব্বতের সঙ্গে ছিল বিশেষ যোগাযোগ। তাই এই সীমান্ত গ্রামটি ক্রেতা বিক্রেতার কলকাকলীতে ছিল মুখর। সেই প্রাচুর্যের দিনে রাজারা, সর্দাররা প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরী করে এখানে সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করত। আজ সব কিছু পরিত্যক্ত। বড় বড় বাড়ীগুলির ভগ্নদশা দেখলে মনে হয় অতীতে এখানে এক বিরাট নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। একটা জায়গায় দেখলাম কয়েকটা বাড়ীকে ঘিরে চারদিকে টানা পাঁচিল। নিরাপত্তার কথা ভেবে হয়ত তৈরী হয়েছিল। এখানকার অতীত ইতিহাস আমার জানা নেই। তবুও বর্তমান ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অতীত গরিমার বহু স্মৃতি আজো অম্লান।

গ্রামটির নাম ঝাড়কোট। আয়তনের তুলনায় বসতি খুব কম। প্রায় সবাই তিব্বতী। শের বাহাদুর বলে ওরা তিব্বতী খাম্পা। রাজা বা সর্দারের হয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ করত। এখন রাজা নেই। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে ওরা কিছুতেই মানিয়ে চলতে পারছে না। ক্রমশঃ দারিদ্র্য এবং হতাশার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তাই অধিকাংশ পুরুষের ছাং এবং জুয়া, নেশা আর পেশা। মেয়েরাও অবলীলাক্রমে দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। অবশ্য মাঝে মধ্যে বেশ কয়েক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থও রয়েছে দেখলাম। গৃহ সংলগ্ন প্রশস্ত শস্যক্ষেত, গোয়াল ভরা গরু ভেড়ার পাল। কলহাস্যে মুখরিত গৃহ প্রাঙ্গণ। গ্রামের মধ্য দিয়ে

এগিয়ে চলি। পিপল গাছের ছায়াঘেরা পথে। অন্য গাছপালা বিশেষ নেই।

ভেবেছিলাম ঝাড়কোট গ্রাম ছাড়ালেই মুক্তিনাথের মন্দির। হা হতোস্মি—। কোথায় মন্দির? এখনো সেই সমান দূরত্ব। পথ যেন শেষ হতে চাইছে না।

ঝারকোট পার হতেই আবার চড়াই পথ। অতিকষ্টে ক্লান্ত দেহ টেনে চলি। শরীর ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে কিছুতেই বুঝি আর পৌঁছতে পারলাম না। মনে মনে মুক্তিনাথকে স্মরণ করি। আর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি।

চলার পথে চোখের সামনে ভেসে উঠে তুষার শুভ্র অন্নপূর্ণার অপরূপ শোভা। অন্নপূর্ণা গিরিমালা নেপালের জীবনদাত্রী অন্নদা। মিরিষ্টিখোলা, মার্সিয়ান্দি, কালী গণ্ডকী প্রভৃতি নদী তুষার শৃঙ্গ থেকে জন্ম নিয়ে নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে করে তুলেছে উর্বর শস্যশালিনী।

এই অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণার রূপের আকর্ষণও কম নয়। দেশ-বিদেশের বহু অভিযাত্রী জীবন তুচ্ছ করে ছুটে গেছে তার কাছে। কেউ তার রূপের আগুনে পুড়ে মরেছে। কেউ অশেষ ক্লেশ সহ্য করে তার কৃপা লাভ করেছে। তাদের সেদিনের গতিপথও ছিল এই কালী-গণ্ডকীর প্রবাহ ধরে। উজানে। আলোচনা প্রসঙ্গে মনে পড়ে অন্নপূর্ণা জয়ের ইতিহাস। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এক জার্মান দল H. Steinmets এর নেতৃত্বে ২৪,৬৮৮ ফুট অন্নপূর্ণা চতুর্থ শৃঙ্গটি জয় করেন। তারপর অন্নপূর্ণা দ্বিতীয় শিখরটি জয় হয় ভারত-নেপাল-বৃটিশ এই তিনটি দেশের মিলিত প্রচেষ্টায়। ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং এবং ডাঃ এম এ সোরেস। নেপালের পক্ষে আং নিমা। বৃটিশ পক্ষে **R. G. Grant, J. O. M. Roberts.** পরে একক ভারতীয় প্রচেষ্টায় এম এস কোহলী সিনি পরে এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয়েও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, [illegible] খৃষ্টাব্দের মে মাসে অন্নপূর্ণার ৩নং শৃঙ্গ আরোহণ করেন। পরে ১৯[illegible]ব্দের অকটোবরে দুই নেপালী অভিযাত্রী S. Ugeo এবং

Prof. A. Higuchi ২৪০০০ ফুট উঁচু অন্নপূর্ণার আরেকটি শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এর পরের বছর Gunter Honser এর নেতৃত্বে ২৬৫০৪ ফুট উঁচু অন্নপূর্ণা ১নং শৃঙ্গ জয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

যাইহোক কালের প্রবাহে কালীগণ্ডকীর বুকে বহু জলধারা বয়ে গেছে। অন্নপূর্ণার টানে ও বর্ষে বর্ষে দলে দলে বহু পর্বত প্রেমিক ছুটে গেছে। কেউ সফল হয়েছে। কেউ বিরাট হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছে। অভিযাত্রীদের ভাগ্যে জয়পরাজয় যাই ঘটুক না কেন মুক্তিনাথ যাত্রীদের কাছে অন্নপূর্ণা প্রেরণাদায়িনী অপরূপা।

মুক্তিনাথ এলাকায় পৌঁছে গেলাম। রাস্তার বাঁ দিকে একটা মাত্র হোটেল। তাছাড়া রয়েছে যাত্রী নিবাস। বিদেশী যাত্রীরা খোলামাঠে অনেকেই তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে। আমরা হোটেলে উঠলাম। যাত্রী নিবাসে দেখলাম নেপালী তীর্থ যাত্রীদের ভীড়। তাছাড়া তুলনায় অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশ।

হোটেলে মালপত্র রেখে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললাম। দেহে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্নের দেবতার দর্শন পাব। দেহ মনে রোমাঞ্চকর আনন্দ শিহরণ।

খানিকটা চড়াই পথে মন্দির চত্বরের দিকে এগিয়ে চলি। মন্দির চত্বরে বেশ কয়েকটা ঘরবাড়ী রয়েছে। অবশ্য কোন বসতি নয়। হয় যাত্রী নিবাস, নয় বিগ্রহের সেবাকার্যে ব্যবহৃত। মুক্তিনাথ মন্দিরের কাছে ডানদিকে একটু নিচেই জওলা দেবীর মন্দির। পথের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তঃসলিলা ঝরণা। কলশব্দে নিচের দিকে নেমে গেছে। প্রবাদ আছে একমাত্র পুণ্যবাণরাই এই পবিত্র স্রোতধারার শব্দ শুনতে পায়।

জওলা দেবীর মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধ-মন্দির। অনেকটা তিব্বতী গুম্ফা ধরণের। পাহাড় কেটে পাথর বসিয়ে মন্দিরের আকারে তৈরী। ভিতরে ভগবান বুদ্ধের বিরাট মূর্তি। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য চিত্র। মূর্তির সামনে জ্বলন্ত প্রদীপের সারি। পূজারী তিব্বতী লামা।

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যেও বেশীর ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

মূর্তির নিচে মেঝেতে তিন জায়গায় গর্ত মত করা। সেখানে তলদেশে একটানা বয়ে চলেছে প্রবল এক জলধারা। জলধারার উপর ভাসমান এক লেলিহান অগ্নিশিখা। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে প্রকৃতির খেলা দেখি। মনে মনে ভাবি কি আশ্চর্য!—জলেও আগুন জ্বলে!

মুক্তিনাথ মন্দির প্রাঙ্গনে উঠে এলাম। প্যাগোডাকৃতি কাঠের মন্দির। পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রাঙ্গন। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে ১০৮টি জলের ধারা। নল বেয়ে পড়ছে। নলের মুখে নানাবিধ জীবজন্তুর আকৃতি। গরু, ঘোড়া, হাতি, সিংহ, উট আরো কত কি।

মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরণা ধারা এই নল দিয়ে মন্দির চত্বরে এসে পড়েছে। এই জলধারার উৎস মুক্তিনাথ পাহাড়ের ওপারে বরফগলা এক জলকুণ্ড। নাম দামোদর কুণ্ড। কালীগণ্ডকীর মূল প্রবাহ নাকি এ দামোদর কুণ্ড থেকেই নির্গত।

এই দামোদর কুণ্ডে নাকি অজস্র নারায়ণ শিলা পাওয়া যায়। মুক্তিনাথের পথে কালীগণ্ডকীর বুকে আজকাল এই শালগ্রাম শিলার অস্তিত্ব ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

একমাত্র কারণ চাহিদা বৃদ্ধি। স্থানীয় লোকেরা এই শিলা সংগ্রহ করে যাত্রীদের কাছে বিক্রী করে। দূরে শহরে চালান দেয়।

এই নারায়ণ শিলার আকার এবং প্রকৃতি এবং পূজারীতি নিয়ে শাস্ত্রীয় বহু মতামত বর্তমান। প্রথমতঃ সত্যিকারের শালগ্রাম শিলা সাধারণতঃ চেনা দুষ্কর। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় অবশ্য লক্ষণাদি বিচার করে গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা আছে। আকার, বর্ণ, গঠন এবং গায়ের চক্র চিহ্নের পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত আছে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়। আবার এই শিলার প্রকৃতি ভেদে পূজার্চ্চণার বিধিও স্বতন্ত্র।

আবার অনেকের কাছে এই শিলার বিজ্ঞান ভিত্তিক অস্তিত্বটাই বেশী আকর্ষণীয়। কোন এক সময় পৃথিবীটা ছিল এক মহাসমুদ্র।

প্রচণ্ড এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আজকের এই বিশাল হিমালয় বহু উচ্চে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কালান্তরে জলজীবের দেহাবশেষ রূপান্তরিত হয় ফসিল এ। রঙ হয় নিকষ কালো। শালগ্রাম শিলার প্রকৃতরূপ।

শালগ্রাম শিলাপ্রসঙ্গে বহু পৌরাণিক কাহিনী ও প্রচলিত।

দেব-অংশ-সম্ভূতা গণ্ডকী কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। দীর্ঘ দশ হাজার বৎসর ধরে চলল এই তপস্যা। অবশেষে ভগবান বিষ্ণু তুষ্ট হয়ে গণ্ডকীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এগিয়ে আসেন। গণ্ডকী বর প্রার্থনা করেন, ভগবান বিষ্ণুকে সন্তান রূপে পেতে। মৃদু হাস্যে ভগবান বলেন, তথাস্তু। সেই থেকে ভগবান বিষ্ণু শালগ্রাম শিলা রূপে কালীগণ্ডকীর গর্ভে বিরাজমান।

এই কাহিনীর প্রতিফলন মুক্তিনাথের পূজা বিধিতেও বর্তমান। তাই মন্দিরে প্রবেশ করার আগে কালীগণ্ডকীর ঐ নল ধারায় অবগাহন স্নান বিধেয়। অমৃতময় এই মাতৃস্নেহধারায় স্নান করে শুচিস্নিগ্ধ অন্তরে দেবতার আরাধনা। অলৌকিক শিহরণে দেহমন পুলকিত হয়। স্বর্গীয় অনুভূতির স্নিগ্ধতায় মনে জাগে অপার শান্তি।

মন্দিরে প্রবেশ করি। বিগ্রহের পানে তাকাই। পিতলের নারায়ণ মূর্তি। চতুর্ভুজ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী নরদেহরূপী নারায়ণ। পূজা বেদীমূলে দণ্ডায়মান। করুণাঘন অভয় দৃষ্টি॥ অঙ্গে পীত বস্ত্রের আবরণ। মাথায় সুবর্ণ মুকুট॥ ছত্রাকারে মাথার উপর বাসুকীর শত সহস্র ফণা। নারায়ণের দু'পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী দণ্ডায়মান। সামনে গরুড়ের মূর্তি। তন্ময় হয়ে বিগ্রহের পানে তাকাই। দুর্গম পরিক্রমা শেষে মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথের চরণ তলে দাঁড়িয়ে অনুভব করি অপার স্বর্গীয় আনন্দ। ধন্য আমি, দেবী কালীগণ্ডকীর অমৃতময় স্নেহ ধারা অনুসরণ করে এসে পৌঁছেছি তাঁরই অমৃতসদনে। এই মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথে। পূজার্চ্চনা শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। মনে মনে বলি—হে করুণাময়, হে জগদীশ্বর, মনের অন্ধকার দূর কর। শক্তি দাও।

শান্তি দাও প্রভু। শান্তি দাও।

পূজা শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াই। চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যেও ধ্যান গম্ভীর সুস্নিগ্ধ সুষমা। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কি মধুর আনন্দঘন ঐকতান। নারায়ণ শুধু মন্দিরে নয়। মহাশক্তির অন্তহীন রূপবৈচিত্র নিয়ে তাঁর দ্যুতি বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে, অন্নপূর্ণা, কালী-গণ্ডকী শালগ্রাম শিলা, ধৌলাগিরি দামোদরকুণ্ড এমন কি ধূসর রুক্ষ গিরি উপত্যকায়।

কয়েকটি হাঁটা পথের নির্দেশিকা

(ক) কাঠমাণ্ডু থেকে গোঁসাইকুণ্ডু।

থেকে	গন্তব্যস্থান	উচ্চতা (মিটার)	দূরত্ব (কিঃ মিঃ)
কাঠমাণ্ডু	ত্রিশূলী বাজার	৫৪১	৭১ (বাস বা মোটর পথ)
ত্রিশূলী বাজার	বেত্রবতী	৬৪১	৮ ” ”
বেত্রবতী	মণিগাঁও	১১৯৬	৪ ঘণ্টার পথ
মণিগাঁও	রামচে	১৭৯১	৩ ”
রামচে	থারে	১৮৯৯	৩ ”
থারে	বোকাঝুণ্ডা	১৮৯০	২ ”
বোকাঝুণ্ডা	ধুনচে	১৯৬৬	২ ”
ধুনচে	চন্দনবাড়ী	৩২৫০	৫ ”
চন্দনবাড়ী	লাউরিবিনা	৩৯০১	৫ ”
লাউরিবিনা	গোঁসাইকুণ্ডু	৪২৯৮	২ ”

(খ) কাঠমাণ্ডু থেকে এভারেষ্ট বেস্‌ক্যাম্প।

থেকে	গন্তব্যস্থান	উচ্চতা (মিটার)	দুরত্ব (ঘণ্টায়)
কাঠমাণ্ডু	লামোসাঙ্গু	৭৪১	৩ ঘণ্টার পথ (মোটর চলে)
লামোসাঙ্গু	থুলোপাখা	১৮২০	৪ ঘণ্টার পথ
থুলোপাখা	সেরাবেন্সি	১৪৪০	৭ "
সেরাবেন্সি	কিরান্তি ছাপ	১৩২০	৬ "
কিরান্তি ছাপ	এ্যারসা	১৯৭৪	৬ "
এ্যারসা	থোসে	১৭৯৯	৭ "
থোসে	ছ্যাঙ্গমা	২১৯৪	৬ "
ছ্যাঙ্গমা	সেতে	২৫৭৫	৬ "
সেতে	জুনবেসি	২৬৭৫	৭ "
জুনবেসি	মণিদিঙ্গমা	২১৯৪	৭ "
মণিদিঙ্গমা	খারিখোলা	২০৭২	৬ "
খারিখোলা	পুঁইয়ান	২৮৩৫	৬ "
পুঁইয়ান	ফাকডিং	২৬৫২	৭ "
ফাকডিং	নামচে বাজার	৩৪৪৬	৬ "
নামচে বাজার	থ্যাংবোচে	৩৮৭৬	৫ "
থ্যাংবোচে	ফেরিচে	৪২৬৭	৫ "
ফেরিচে	লোবুজে	৪৯৩০	৬ "
লোবুজে	গোরক্‌মোপ্‌	৫১৮৪	৪ "
গোরক্‌মোপ্‌	বেস্ ক্যাম্প	৫৩৫৬	৪ "

(গ) পোখরা থেকে মুক্তিনাথ

থেকে	*গন্তব্যস্থান*	*উচ্চতা (মিটার)*	*দূরত্ব (কিঃ মিঃ)*
পোখরা	হুন্‌জা গ্রাম	১০৬৭	৭ ” ”
হুন্‌জাগ্রাম	সুঁইক্ষেত	১০৯৭	৫ ” ”
সুঁইক্ষেত	নাগডাণ্ডা	১৪৪৩	২ ” ”
নাগডাণ্ডা	খারে	১৬৪৬	৫ ” ”
খারে	তিরকেধুঙ্গা	১৪৩৯	১৫ ” ”
তিরকেধুঙ্গা	ঘোরেপানি	২৮৩৫	৮ ” ”
ঘোরেপানি	তাতোঁপানি	১১৮৯	১৫ ” ”
তাতোপানি	দানা	১৪৪৮	৬ ” ”
দানা	ঘাসা	২০১২	৯ ” ”
ঘাসা	লারজুং	২৫৬০	১৮ ” ”
লারজুং	টুকুচে	২৫৯০	৬ ” ”
টুকুচে	জুমস্থুম	২৭১৩	১১ ” ”
জুমস্থুম	মুক্তিনাথ	৩৭৯৫	২০ ” ”